শারীরিক শাস্তি ও আমাদের সংবিধান

শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলা রক্ষা ও নিয়ন্ত্রণের নামে যে সব শাস্তি দেওয়া হয় তা আমাদের সংবিধানের সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। আমাদের সংবিধানের-

২৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী :
সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী।

৩১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী :
আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহারলাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।

৩২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী :
আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।

৩৫(৫) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী :
কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাইবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দন্ড দেওয়া যাইবে না কিংবা কাহারও সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না।

সুতরাং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি আমাদের সংবিধানের পরিপন্থী

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)
ওয়াইএমসিএ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, ১/১ পাইওনিয়ার রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৯৩৪ ৯১২৫, ৮৩১ ৩৬৮৯, ফ্যাক্স: ৯৩৪ ৭১০৭
mail@blast.org.bd, www.blast.org.bd

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)

Save the Children

সূচিপত্র

১. ভূমিকা..... ৪

২. নাগরিক দৃষ্টিতে শারীরিক শাস্তি..... ৫
ড. মিজানুর রহমান, *সভাপতি, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন*
সেলিনা হোসেন, *কথা সাহিত্যিক, সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন*
ড. মেহতাব খানম, *অধ্যাপক, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
আদিল হোসেন নোবেল, *মডেল তারকা*

৩. *বাংলাদেশ লিগাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) বনাম বাংলাদেশ এবং অন্যান্য:* ১৩ জানুয়ারী ২০১১ তারিখে ঘোষিত বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের সার-সংক্ষেপ..... ৯

৪. *ব্লাস্ট এবং আসক বনাম বাংলাদেশ :* পূর্ণাঙ্গ রায়ের বাংলা সংস্করণ... ১৪

৫. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি প্রদান বন্ধ করন প্রসঙ্গে ৯ আগস্ট ২০১০ তারিখে প্রকাশিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র ৩২

৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদান রহিত করন সক্রান্ত নীতিমালা-২০১১ ..... ৩৪

১. ভূমিকা

প্রত্যেক শিশু তার বাবা-মায়ের নয়নের মনি। তারপরও বাবা-মা তাদের সন্তানদের উপর প্রত্যক্ষ শাস্তি দেয়, যদিও তা ঠিক নয়। আর এই শারীরিক শাস্তির নামে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন ভয়ঙ্কর শাস্তি সমূহ নিয়ম কানুন রক্ষার অজুহাতে দেওয়া হয় যা কখনই কাম্য নয়।

২০১০ এর শুরুতে সংবাদপত্রেও এরকম প্রচুর খবর এসেছে যে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ৬ থেকে ১৩/১৪ বছর বয়সী ছেলে-মেয়ে উভয় শিক্ষার্থীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তির শিকার হচ্ছে। এরই প্রেক্ষিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি (প্রহার, বেত্রাঘাত ইত্যাদি) মানবাধিকারের লঙ্ঘন হিসেবে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) ১৮ জুলাই ২০১০ একটি রিট পিটিশন দায়ের করে (রিট পিটিশন নং-৫৬৮৪/২০১০)। সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ২০১১ সনের ১৩ জানুয়ারিতে রায় দেন। রায়ে বলা হয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি শিশুদের জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘন করে এবং তা নিষ্ঠুর, অমানবিক, অপমানকর আচরণ। বিশেষ করে বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭, ৩১, ৩২, ৩৫(৫) অনুচ্ছেদ ও মানবাধিকারের পরিপন্থী।

এই রায়ের প্রেক্ষিতে বিগত ২৫ এপ্রিল ২০১১ শিক্ষা মন্ত্রনালয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি নিষিদ্ধ করে 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা সংক্রান্ত নীতিমালা - ২০১১' জারি করে। এ নীতিমালা সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক - উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসাসহ (আলিম পর্যন্ত) অন্য সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য হবে। এ নীতিমালাটিতে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং নীতিমালার পরিপন্থী কাজের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে।

যদিও শিশুদের উপর শারীরিক ও মানসিক শাস্তি আরোপ আমাদের দেশে নতুন কিছু নয়, তারপরও এই শারীরিক শাস্তির বিষয়টি সবার কাছে স্পষ্ট নয়। তাই এ সংক্রান্ত বিষয়াবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়াই আমাদের এই বুকলেট প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশ লিগাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)
২৭ ডিসেম্বর ২০১১

২. নাগরিক দৃষ্টিতে শারীরিক শাস্তি

ড. মিজানুর রহমান
চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

শিশুদের ওপর শারীরিক শাস্তির প্রভাব হতে পারে মারাত্মক। শারীরিক প্রভাবের পাশাপাশি এটি মারাত্মক মানসিক প্রভাব ফেলে। একদিকে এতে করে শিশুদের মনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ভীতি তৈরী হয় অন্যদিকে এ ধরণের আচরণ তাদের মধ্যে নিষ্ঠুরতা তৈরী করে। এ ধরণের ঘটনা ঘটলে অভিভাবকদের উচিত শিশুর সঙ্গে কথা বলা, তাকে মানসিক শক্তি যোগানো। পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গঠনমূলক আলোচনা করা উচিত। শিক্ষকদের উচিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতার চর্চা তৈরীতে শারীরিক শাস্তির বিকল্প পন্থা খোঁজা এবং শিক্ষার্থীদের জন্য আনন্দপূর্ণ শিক্ষা পদ্ধতি ও উপকরণ ব্যবহার করা। শারীরিক শাস্তি বিষয়ে সকলের 'শূন্য সহনশীলতা' প্রদর্শন করা উচিত। স্কুলের নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য বিকল্প ইতিবাচক ব্যবস্থা উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করা উচিত। ছাত্র ছাত্রীদের কাউন্সেলিং-এর জন্য প্রতিটি স্কুলে পেশাদার কাউন্সেলর থাকা প্রয়োজন। তাছাড়া পাঠ্যক্রমে পাঠদান প্রক্রিয়ার মধ্যে ও কাউন্সেলিং -এর ওপর গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। স্কুলে প্রাথমিক চিকিৎসা সুবিধা রাখা প্রয়োজন।

এই শিশুরাই যেহেতু ভবিষ্যতে সমাজে নেতৃত্ব দেবে তাই অবশ্যই এ প্রবণতা সমাজ বিকাশের পথে বড় অন্তরায়। এ থেকে উত্তরণের জন্য নানমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষা পদ্ধতি আনন্দপূর্ণ করা উচিত। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো ব্যবস্থা উন্নত করা প্রয়োজন। পুথিগত জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি অন্য সহশিক্ষা কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা উচিত।

এ ব্যাপারে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন কারণ দীর্ঘদিন ধরে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলোতে এই চর্চা চলে আসছে। এর কোন বিকল্প আছে অনেক তা ভাবতেই পারেন না। তাই দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এই মানসিকতা পরিবর্তনে অনেক কাজ করতে হবে।

সেলিনা হোসেন
কথা সাহিত্যিক, সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

স্কুলের শিক্ষার্থী তা যে কোন শ্রেণীরই হোক না কেন শারীরিক শাস্তি প্রদান করলে সে শিক্ষার্থীর মানসিক ও শারীরিক দুটোই ক্ষতি হয়। মানসিক ক্ষতি হয় তার ব্যক্তিত্বের জায়গা থেকে। অনেকের সামনে তাকে অপমান করা হলে সেটা মেনে নেয়া তার জন্য কঠিন হয়। সেজন্য শারীরিক শাস্তি দিয়ে কোন শিক্ষার্থীকে শাসন করতে গেলে সে কাজটি তাকে পরবর্তী সময় পর্যন্ত ক্ষুব্ধ করে রাখে। আর স্বাভাবিক বিকাশে তাকে বাধাগ্রস্ত করে। একজন সাহসী মানুষ হিসেবে বড় হয়েও তার ক্ষতি হয়। সুতরাং শ্রেণীকক্ষে এই অপমানটি শিক্ষার্থীকে কোনভাবেই করা উচিত নয়। তাকে শাসনের ভার সোহাগের সঙ্গে দিতে হবে। তাকে বুঝতে দিতে হবে সে যে অন্যায়টি করেছে সে অন্যায়টি তার করা উচিত হয় নি। তাহলেই সে একটি পূর্ণ মানুষ হিসেবে বিকশিত হওয়ার ধারণাটি সেই বয়সেই লাভ করবে এবং নিজেও এ ধরণের অন্যায় করা থেকে বিরত থাকার বিষয়টি শিখবে। তাকে শাসন করা কেন দরকার সে বিষয়টি তাকে শিখতে হবে। সেটা প্রহার করে নয় তাকে বুঝিয়ে করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, শারীরিক প্রহার অনেক সময় বেকায়দায় এমনভাবে তার গায়ে লাগতে পারে যেটি তার একটি অঙ্গকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এই সাবধানতা অবলম্বন করা মানবিক বিবেচনার দিক থেকে ভয়ানক জরুরী। আমি মনে করি, শারীরিক শাস্তি থেকে বিরত থাকলে আমাদের প্রজন্মকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য খুবই সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে।

ড. মেহতাব খানম

অধ্যাপক, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি প্রদান আমাদের দেশে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে। কিন্তু আমাদের এটা বুঝতে হবে যে, ভয় দেখিয়ে নয় ভাল কাজের স্বীকৃতি দিয়ে শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলতে হবে। বাচ্চাদের সামনে নেতিবাচক শৃঙ্খলা নয় ইতিবাচক শৃঙ্খলা দিতে হবে। সচরাচর আমরা স্কুলে, বাসায় সর্বত্রই মারধর করি, ভয় দেখাই। এমন কি বাচ্চাদের খাওয়ানোর সময়ও ভয় দেখানো হয়। এতে তার মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। আর বাচ্চাকে মারধর করলে ও তাতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। সেও তার চাইতে কম শক্তিশালীকে মারবে। অন্যকে চ্যালেঞ্জ করবে। যার প্রভাব আমরা আমাদের সমাজে দেখতে পাচ্ছি।

শিক্ষকদেরও এখন বিকল্প ভাবতে হবে। ভাল কাজকে উৎসাহিত করতে হবে, পুরস্কৃত করতে হবে। তবে অন্যরাও উদ্বুদ্ধ হবে। আর স্কুলেও কাউন্সিলিং এর ব্যবস্থা, শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা উচিত। এটা বুঝতে হবে শাস্তি দিয়ে মানুষকে সুন্দর জীবন দেয়া যায় না। অভিভাবকদেরও বুঝতে হবে আমরা বাচ্চাদের পর্যাপ্ত সময় দিচ্ছি না। বদলে যা চাইছে তাই দিয়ে দিচ্ছি, অন্যদিকে অতিরিক্ত শাসন করছি। ফলে বাচ্চারা ধৈর্য ধরতে শিখছে না। এক্ষেত্রে অভিভাবক, শিক্ষক সবারই মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে।

আদিল হোসেন নোবেল

মডেল তারকা

আজকাল আমাদের দেশে শহর ভিত্তিক যে সব স্কুল, উল্লেখ্য ভিকারুন্নেসা, হলিক্রস বা অন্যান্য ইংরেজী মাধ্যম স্কুল (যেমন উইলস্ লিটল ফাওয়ার স্কুল) গুলোতে শারীরিক শাস্তি দেয়া হয় না। শিক্ষকরা অনেকরকম পদ্ধতি অবলম্বন করেন। অভিভাবকদের ডেকে পাঠান বা সাবধান করেন, কখনোই শারীরিক শাস্তি দেন না। অভিভাবক হিসেবে আমিও কখনো আমার বাচ্চাদের শারীরিক শাস্তি দেইনি।

শারীরিক শাস্তি প্রদানের হার বর্তমানকালে বাস্তবিকই অনেক কমেছে যার প্রধান কারণ হয়তো যুগের ও মানসিকতার পরিবর্তন। তারপরও কোন কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিশেষত মাদ্রাসায় শারীরিক শাস্তি প্রদান করা হচ্ছে।

এভাবে শারীরিক শাস্তি নয় বরং তাদের সাথে আন্তরিকভাবে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য অনুপ্রেরণা দিতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুন্দর পরিবেশ দিয়ে শিশুদেরকে লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে হবে, যেন তারা তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে। এ উদ্দেশ্যকে সফল করতে সবচেয়ে বেশি জরুরী শিক্ষক, অভিভাবক ও আমাদের সবার মানসিকতার পরিবর্তন।

৩. *ব্লাস্ট এবং আস্‌ক বনাম বাংলাদেশ:* সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের ১৩ জানুয়ারী ২০১১ তারিখে ঘোষিত রায়ের সার-সংক্ষেপ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বাংলাদেশে বহুকাল আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। এটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসে শিক্ষাগ্রহণের জন্য এবং আনন্দের সাথে শিক্ষা গ্রহণ করাই ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষা বিকাশে সাহায্য করে। এ কারণে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আনন্দময় পরিবেশে শিক্ষা প্রদান করা প্রত্যেকটি শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য হওয়া উচিত। শারীরিক ও মানসিক শাস্তির মাধ্যমে শিক্ষা প্রদানের বহুল প্রচলিত ধারা চলে আসছে তা কোনভাবেই যেমন একজন শিক্ষার্থীর কাম্য নয় ঠিক তেমনি কোন শিক্ষকেরও শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসাবে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদান করা থেকে বিরত থাকা উচিৎ। তার পরেও যদি কোন ছাত্র বা ছাত্রী শ্রেণীকক্ষে দুর্বীনিত আচরণ করে, তাহলে তার অভিভাবককে ডেকে এনে বিষয়টির সমাধান করা যেতে পারে। কিন্তু কোনক্রমেই শারীরিক বা মানসিক শাস্তি প্রদান করা যাবে না।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তির ফলে একদিকে শিক্ষার পরিবেশ যেমন ব্যাহত হয়, অন্যদিকে তাদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বন্ধ করা হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আনন্দঘন পরিবেশ বজায় থাকবে এবং শিশুরা সুন্দরভাবে গড়ে উঠবে। এ ছাড়া শিশু আইন অনুযায়ী, ৯ বছর বয়স পর্যন্ত কোন শিশুকে শাস্তি দেওয়া সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ গত ১৩ জানুয়ারি, ২০১১ তারিখে জনস্বার্থে দায়ের করা একটি রীট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে স্কুল এবং মাদ্রাসায় সব ধরনের শারীরিক শাস্তি অসাংবিধানিক ও মানবাধিকারের লংঘন ঘোষণা করে রায় প্রদান করেন। বিচারপতি মোঃ ইমান আলী ও বিচারপতি মোঃ হাসান আরিফের সমন্বয়ে গঠিত একটি ডিভিশন বেঞ্চ এ রায় দেন। এই রায়ে উল্লেখ করা হয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষক দ্বারা কোন রকম শারীরিক শাস্তি এবং নিষ্ঠুর, অমানবিক, অপমানকর আচরণ শিশু শিক্ষার্থীদের জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা সাংবিধানিক অধিকার লংঘন করে। বিশেষ করে তা বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭, ৩১, ৩২, ৩৫(৫) অনুচ্ছেদ ও মানবাধিকারের পরিপন্থী।

উল্লেখ্য, ২১শে এপ্রিল ২০০৮ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শিশুদের শারীরিক, মানসিক নির্যাতন, কঠোরতা ও তিরস্কারসহ সব ধরনের অবাঞ্ছিত আচরণ থেকে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তায় এ বিষয়ে পারিবারিক পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানিয়ে একটি পরিপত্র জারী করেছেন।

কিন্তু বিগত তিন বছরে সংবাদপত্র সূত্রে দেখা যায়, মোট ২৪৫ জন শিশু স্কুল শিক্ষক কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ছেলে ১৪১ জন ও মেয়ে ১০৪ জন। জানুয়ারি ২০১০ থেকে স্কুলের শিশুদের প্রতি নির্যাতনের হার উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পায়।

শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকদের এই ক্রমবর্ধমান শারীরিক নির্যাতন এবং তা প্রতিরোধে সরকারের ক্রমাগত ব্যর্থতাকে চ্যালেঞ্জ করে মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) ১৮ই জুলাই ২০১০ একটি রীট পিটিশন দায়ের করে (রীট পিটিশন নং-৫৬৮৪/২০১০)। এই রীট আবেদনের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্তৃক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন প্রতিরোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে সাংবিধানিক ও আইনগত দায়িত্ব পালনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতাকে কেন অসাংবিধানিক ও বেআইনি ঘোষণা করা হবে না- মর্মে রুল জারি করেন। সেই সাথে শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা বোর্ডগুলোকে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে কেন নির্দেশনা প্রদান করা হবে না, সে মর্মে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেন। নির্দেশগুলো হলো-

১. ছাত্রছাত্রীদের প্রতি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আচরণ এবং এর কার্যকারিতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ;
২. ছাত্রছাত্রীদের প্রতি শারীরিক নির্যাতনের ঘটনার অভিযোগ তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদালতে প্রেরণ;
৩. ছাত্রছাত্রীদের প্রতি শারীরিক নির্যাতন যে অপরাধ, সে বিষয়ে রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন এবং বেতারে তথ্য প্রচার করা;
৪. শারীরিক নির্যাতনের ঘটনা চিহ্নিতকরণের উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা।

রায়ে আদালত নিম্নলিখিত নির্দেশনা সমূহ প্রদান করেছেন :

১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি সংক্রান্ত চূড়ান্ত নির্দেশনা তৈরি করে তার সুষ্ঠু বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।
২. সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) রুলস ১৯৮৫-তে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তির বিষয়টি 'অসদাচরণ' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের বেত্রাঘাত করা, আটকে রাখা, প্রহার করা, চুল কেটে দেওয়া, শিকল দিয়ে আটকে রাখাসহ এ ধরনের শাস্তি অসদাচরণ হিসেবে গণ্য হবে।

৩. স্কুল ও মাদ্রাসা পরিদর্শনের মধ্যে সব প্রকার শারীরিক শাস্তি, এ-সংক্রান্ত অভিযোগ তদন্ত ও দোষী ব্যক্তিদের ব্যাপারে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা অন্তর্ভুক্ত হবে। পাশাপাশি ভিকটিমের নিরাপত্তার বিষয়টিও দেখতে হবে।
৪. এ ধরনের তদন্তের গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে এবং ভিকটিমের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।
৫. এসব নির্দেশনা সুষ্ঠুভাবে পালন হচ্ছে কি না তা তদারকি করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে একটি জাতীয় কমিশন বা কমিটি গঠন করতে হবে।
৬. জেলা পর্যায়ে ডেপুটি কমিশনারের অধীনে একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করতে হবে।
৭. জাতীয় মনিটরিং কমিটি কর্তৃক কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, প্রতি ছয় মাস পর পর সে সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন আদালতে পেশ করবে।
৮. সারা দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তির ঘটনা ঘটেছে কি না এবং কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, তা তদারকির জন্য একটি স্বাধীন কমিশন নিয়োগ দিতে হবে।

এছাড়া হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক মাদ্রাসাসহ সব প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন বন্ধে প্রশাসনিক আদেশ জারি করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ৬ই আগস্ট ২০১০ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা বোর্ডকে ইতিমধ্যে স্কুলগুলোতে সংঘটিত ঘটনাগুলোর বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদনসহ কী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা জানিয়ে দুই মাসের মধ্যে রিপোর্ট প্রদান করতে বলে। ভাছাড়া অবিলম্বে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (মাদ্রাসাসহ) সার্কুলারের মাধ্যমে শারীরিক শাস্তি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করার কথাও বলা হয়।

এছাড়া, শারীরিক শাস্তি প্রদান সংক্রান্ত অপরাধের সাথে জড়িত শিক্ষকদের কোন কোন বিধিমালা ও আইনের আওতায় শাস্তি প্রদান করা যাবে সে সম্পর্কেও স্পষ্ট নির্দেশনা দেয়।

উক্ত রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিগত ২১ এপ্রিল ২০১১ শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি নিষিদ্ধ করে 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা-সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১১' জারি করে। এ নীতিমালা সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসাসহ (আলিম পর্যন্ত) অন্য সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য। নীতিমালাটিতে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং নীতিমালা পরিপন্থী কাজের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে।

নীতিমালানুযায়ী:

শারীরিক শাস্তি: শারীরিক শাস্তি বলতে ছাত্রছাত্রীকে কোন ধরনের দৈহিক আঘাত করাকে বোঝাবে। এর আওতায় শিক্ষকরা কোন ছাত্রছাত্রীকে-

১. হাত-পা বা কোন কিছু দিয়ে আঘাত করতে পারবেন না;
২. তাদের দিকে চক/ডাস্টার বা এ-জাতীয় বস্তু ছুঁড়ে মারা যাবে না;
৩. ছাত্রছাত্রীদের শরীরে আঁচড় বা চিমটি কাটা যাবে না;
৪. এমনকি তাদের শরীরের কোন স্থানে কামড়ও দেওয়া যাবে না;
৫. শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের চুল ধরে টানতে বা কাটতে পারবেন না;
৬. ছাত্রছাত্রীদের হাতের আঙুলের ফাঁকে পেনসিল চাপা দিয়ে মোচড় দিতে পারবেন না;
৭. ছাত্রছাত্রীদের কান ধরে উঠবস করানো বা ঘাড় ধরে ধাক্কা দেওয়া যাবে না;
৮. চেয়ার-টেবিল বা কোন কিছুর নিচে ছাত্রছাত্রীদের মাথা ঢুকিয়ে রাখা, হাঁটু গেড়ে দাঁড় করানো, রোদে দাঁড় করিয়ে বা শুইয়ে রাখা কিংবা সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড় করিয়ে রাখা যাবে না এবং
৯. ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে এমন কোন কাজ করানো যাবে না, যা শ্রম আইনে নিষিদ্ধ রয়েছে।

মানসিক শাস্তি : শুধু শারীরিক শাস্তি নয়, শিক্ষার্থীদের কোনরূপ মানসিক শাস্তিও দেওয়া যাবে না বলে নীতিমালায় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। শ্রেণীকক্ষে কোন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে বাজে মন্তব্য করা যাবে না। এ ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের মা-বাবা, বংশ পরিচয়, গোত্র, বর্ণ, ধর্ম ইত্যাদি সম্পর্কেও শিক্ষকরা অশালীন মন্তব্য করতে পারবেন না। একই সঙ্গে শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অশোভন অঙ্গভঙ্গি বা এমন কোন আচরণ করবেন না, যা তাদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

শারীরিক শাস্তির ক্ষতিকর দিক: শারীরিক শাস্তির মারাত্মক ক্ষতিকর দিকগুলো পর্যবেক্ষণ করলেই এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, শারীরিক শাস্তির বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে যাওয়া উচিত। শারীরিক শাস্তি শিশুর শারীরিক, মানসিক বিকাশের পথে অন্তরায়। এটি শিশুকে স্কুলের প্রতি অনাগ্রহী করে তোলে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিশুরা স্কুলও ছেড়ে দেয় যা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ার ক্ষেত্রে ভয়ানক প্রভাব ফেলবে।

শিক্ষকদের শাস্তি : নীতিমালা অনুযায়ী কোন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত কোন ব্যক্তি ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি দিলে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এমনকি এসব অপরাধের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে তা ১৯৭৯ সালের সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী হবে। অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। যাদের ক্ষেত্রে এ দুটি আইন প্রযোজ্য হবে না, তাদের ক্ষেত্রে ফৌজদারি আইনে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

নীতিমালার আওতায় ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বন্ধে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর এবং কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচারকাজ চালাবেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারি করা পরিপত্র ও নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও শারীরিক শাস্তির কুফল সম্পর্কে জানাবেন। পরিচালনা পর্ষদ শাস্তি বন্ধের পদক্ষেপ ও সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেবে। এতে পরিচালনা পর্ষদ ও শিক্ষা প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত তদারকি ও নীতিমালা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবেন।

অহেতুক অভিযোগ এড়াতে শাস্তির প্রকৃতি সম্পর্কে অভিভাবকদের সচেতন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে নীতিমালায়। এ ছাড়াও শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রতিরোধের বিষয়ে শিক্ষক, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে।

৪. ব্লাস্ট এবং আস্‌ক বনাম বাংলাদেশ: পূর্ণাঙ্গ রায়ের বাংলা সংস্করণ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(বিশেষ আদিম অধিক্ষেত্র)

রীট পিটিশন নং ৫৬৮৪/ ২০১০

এই বিষয়ে ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ
৪৪ এবং ১০২ এর অধীনে একটি আবেদন

-এবং-

এই বিষয়েঃ

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট
(ব্লাস্ট) এর পক্ষ হতে ফরিদা ইয়াসমিন ডেপুটি
ডিরেক্টর (আইন) এবং অন্যান্য .....বাদী

-বনাম-

সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,
ঢাকা এবং অন্যান্য.....বিবাদী

সারা হোসেন, এডভোকেট এর সহিত
অবন্তি নুরুল,
মোঃ তৌফিকুল ইসলাম, ও
মেহজাবিন রাব্বানী, এড্‌ভোকেট..... বাদী পক্ষে
মোঃ মোবারক হোসেন, এড্‌ভোকেট.....১৫ নং বিবাদী পক্ষে
মোঃ কাজী মইনুল হাসান, এড্‌ভোকেট.....১৬ নং বিবাদী পক্ষে
মোঃ হারুন-অর-রশিদ, এড্‌ভোকেট...২১ ও ৩৫ নং বিবাদী পক্ষে
মোঃ তাসাদ্দুক হাসান, এড্‌ভোকেট.....৩৭ নং বিবাদী পক্ষে
মোঃ ওয়ালী-উল ইসলাম, এড্‌ভোকেট...৪১ নং বিবাদী পক্ষে
মোঃ মোতাহার হোসেন, ডেপুটি এটর্নি জেনারেল এর সহিত
সমরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, এসিস্ট্যান্ট এটর্নি জেনারেল এবং
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, এসিস্ট্যান্ট এটর্নি জেনারেল...অন্যান্য বিবাদীর পক্ষে

উপস্থিতিঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ ইমান আলী — শুনানী ঃ ০৫.০১.২০১১, ০৬.০১.২০১১
এবং — ১১.০১.২০১১ ও ১২.০১.২০১১
বিচারপতি জনাব মোঃ শেখ হাসান আরিফ — রায়ঃ ১৩.০১.২০১১

বিচারপতি জনাব মোঃ ইমান আলীঃ

১. শিশুরা তাদের বাবা মায়ের নয়নের মনি। সারা পৃথিবীতে সন্তানহীন বাবা-মারা ব্যাকুলভাবে সন্তান কামনা করেন এবং যেসব ভাগ্যবান বাবা-মার সন্তান আছে তারা তাদের সন্তানদের খুব ভালবাসে। কিন্তু তারপরও এটি মাঝে মাঝে দেখা যায় যে, কখনো কখনো বাবা মা তাদের সন্তানদের শারীরিক শাস্তি দেয়। যা এই আবেদনে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। উল্লেখ্য যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্বারা শিশুরা 'শারীরিক শাস্তির' শিকার হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়ম কানুন রক্ষার নামে তাদের নিষ্ঠুর শাস্তি দেয়া হয়েছে। ২০১০ এর শুরুতে সংবাদপত্রে এরকম প্রচুর সংবাদ এসেছে যে, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (মাদ্রাসা, প্রাথমিক, উচ্চ বিদ্যালয়) বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থী, ছেলে ও মেয়ে উভয়েই, বিশেষ করে ৬ থেকে ১৩/১৪ বছর বয়স্ক শিক্ষার্থীরা, শারীরিক শাস্তির শিকার হয়েছে।

২. ২০১০ সালে সরকারী এবং বেসরকারী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসাসহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ছাত্রীদের উপর শারীরিক শাস্তির ঘটনা যেমন, প্রহার, বেত্রাঘাত ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিষয়টি মানবাধিকারের লঙ্ঘন হিসেবে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এবং বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) ১৮ জুলাই ২০১০ সংবিধানের ১০২ ধারার অধীনে একটি আবেদন করেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুদের শারীরিক শাস্তির অভিযোগের তদন্তের পদক্ষেপ গ্রহণ, নিষ্ঠুর, অমানুষিক এবং লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তিপ্রদান এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপুরণ প্রদান সহ বিবাদীগণ তাদের আইনগত ও সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়। উভয় আবেদনকারীই সমাজের বঞ্চিত, নিপীড়িত ও প্রান্তিক জনসাধারণের পক্ষে দীর্ঘদিন থেকে সফলভাবে জনস্বার্থ মামলা পরিচালনা করে আসছে। ১৮.০৭.২০১০ তারিখে রুলনিশি জারী করা হয়:

আদালত এ মর্মে বিবাদীর উপরে রুল নিশি জারি করে কারণ দর্শাতে যে কেন,

(ক) সংযুক্তি ১ সিরিজের ৩১-৪৩ নং বিবাদীদের দ্বারা দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুদের উপর শারীরিক শাস্তি প্রদানের যে ঘটনাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে, সে বিষয়ে বিবাদী ১ থেকে ১৬, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শারীরিক শাস্তি প্রতিরোধকল্পে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হওয়া যদিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি প্রতিরোধ করা তাদের সাংবিধানিক ও আইনগতভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল; বিবাদী নং ১ থেকে ১৬ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি প্রতিরোধ করতে যথাযথ আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন না করে তাদের সাংবিধানিক ও আইনগত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে ব্যর্থ হওয়া এবং যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শারীরিক শাস্তি প্রদানে উল্লেখিত ঘটনাবলী ঘটেছে সেসব ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত সম্পাদন করে ঐ ঘটনাগুলোর সাথে জড়িত দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান না করা সংবিধানের ২৭, ৩১, ৩২ এবং ৩৫(৫) ধারা লংঘন হিসেবে ঘোষণা করা হবে না;

(খ) সংযুক্তি ক এ যেসব ঘটনা বর্ণিত আছে তার ভিত্তিতে বিবাদী নং ১ থেকে ১৬ কে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক তদন্ত করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কোন নির্দেশনা দেয়া হবে না

(গ) ১ থেকে ১৬ নং বিবাদীকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে নির্দেশ প্রদান করা হবে না ঃ

(অ) শারীরিক শাস্তির ঘটনাগুলো যথাযথ তদন্ত করা হয়েছে কিনা এবং দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে কিনা তার ভিত্তিতে একটি প্রতিবেদন আদালতে পেশ করা;

(আ) প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ সংস্থার মাধ্যমে শিশুদের নিরাপদ, কার্যকর, আনুপাতিক এবং মানবিকভাবে নিয়মকানুন শিক্ষার জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা;

(ই) শারীরিক শাস্তি যে একটি অপরাধ এই বিষয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বেতারে ব্যাপকভাবে প্রচার করা।

(ঈ) শিশুদের শারীরিক শাস্তি প্রদান সংক্রান্ত ঘটনাগুলো সংঘটিত হচ্ছে কিনা খতিয়ে দেখার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়মিত পরিদর্শন করা।

৩. রুলটির শুনানী মুলতবি করে বিবাদী ১ থেকে ১৬, যারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা বোর্ডের উচ্চপদস্ত কর্মকর্তা তাদেরকে সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুদের শারীরিক শাস্তি প্রদান সংক্রান্ত অপরাধের তদন্ত করার জন্য ও এর সাথে জড়িতদের শাস্তি প্রদান প্রসঙ্গে বিশেষ করে রীট আবেদনের সংযুক্তিতে বর্ণিত ঘটনাবলী সম্পর্কে রিপোর্ট দাখিল করতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছিলো। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুদের উপর শারীরিক শাস্তি বন্ধের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে পরিপত্র জারীর জন্য বিবাদী নং ১, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবকে নির্দেশ প্রদান করা হয়।

৪. ৯.৮.২০১০-এ ১ নং বিবাদী কর্তৃক সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করে পরিপত্র জারি করা হয় যেখানে শারীরিক শাস্তিকে অসদাচরণ বলে গণ্য করা হয়। পরিপত্রটি জেলা শিক্ষা অফিসার এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে শারীরিক শাস্তি প্রদান নির্মূল করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে এবং এই অপরাধের সাথে জড়িতদের দণ্ডবিধি ১৯৬০ এবং শিশু আইন ১৯৭৪ এর জন্য যেটি প্রযোজ্য হয় সেই অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তাদের শারীরিক শাস্তি প্রদান রোধকল্পে তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। স্কুলগুলোর তত্ত্বাবধায়ক কমিটিকে যেসব শিক্ষক প্রত্যক্ষভাবে শারীরিক শাস্তির সাথে জড়িত তাদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল। সার্কুলারে আরও নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে অফিসসমূহ এবং শিক্ষাবোর্ডসমূহ দ্বারা নিয়োজিত পরিদর্শক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শনের সময় শারীরিক শাস্তি প্রদানের বিষয়গুলো খতিয়ে দেখবেন এবং এই ব্যাপারে একটি প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

৫. ১৮.০৮.২০১০ তারিখে ১ নং বিবাদী একটি হলফনামার মাধ্যমে উপরোল্লিখিত পরিপত্রটির একটি কপি পেশ করে এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ডিরেক্টর জেনারেলকে রুলে বর্ণিত মামলা গুলোর উপর তদন্ত করার জন্য এবং এর উপর জরুরী ভিত্তিতে প্রতিবেদন করার নির্দেশনা দেয়। সেই সাথে ২৯.০৮.২০১০ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত করার জন্যও নির্দেশনা দেয়, যেখানে শারীরিক শাস্তি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি খসড়া দিক নির্দেশনা প্রণয়ন করা হবে। ১৮.০৮.১০ এ আরও একটি সংবাদপত্র প্রতিবেদন আমাদের দৃষ্টিতে আসে যে, একটি মেয়ে তার নিজের ব্যাগ ফেলে দেয়ায় পঞ্চম শ্রেণীর একটি ছাত্রী হেসে উঠেছিল, হাসির কারণে ঐ ছাত্রীকে অমানবিকভাবে পেটানো হয়েছিল। এই ঘটনাটি ঘটে ডেমরা, ঢাকাতে যা কোর্ট এলাকা থেকে খুব দূরে নয়। ঐ একই দিনে আদালতে একটি আদেশ জারী করে বিবাদী নং ১ - ৭ কে এই ব্যাপারে তাৎক্ষণিক তদন্ত করার জন্য, যা আমাদের দৃষ্টিতে আনা হয়েছিল ঐ দিনই।

৬. ০৫.০৯.২০১০ তারিখে দাখিলকৃত একটি হলফনামার মাধ্যমে বিবাদী নং-১, ২৯.০৪.২০১০ তারিখে সংগঠিত একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা এর সারাংশ-এর কপি আদালতে উপস্থাপন করে যেখানে শারীরিক শাস্তি নিয়ন্ত্রণকল্পে শিক্ষকদের একটি প্রশিক্ষণ পুস্তিকা তৈরী করার কথা বলা হয়। বিভিন্ন গণমাধ্যম যেমন, রেডিও, টিভি, বেসরকারী টিভি চ্যানেল এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় শারীরিক শাস্তি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ব্যাপকভাবে প্রচার করার কথাও বলা হয় এখানে। তদুপরি, ইউনিসেফকেও এ সংক্রান্ত লিফলেট ও পোস্টার প্রচার ও প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

৭. ০৫.০৯.২০১০ তারিখ রীট আবেদনকারীগণ রীট আবেদনে উল্লেখিত ১৪টি ঘটনার তদন্ত প্রতিবেদন উল্লেখ করে একটি সম্পূরক হলফনামা উপস্থাপন করে। একই দিনে কোর্ট আরেকটি নির্দেশের মাধ্যমে বিবাদী নং ১ থেকে ৭কে পূর্ববর্তী আদেশ যেটি ১৮.০৮.২০১০ এ প্রচারিত হয়েছিল, সেই আদেশে উত্থাপিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে তদন্ত করতে ও প্রতিবেদন দিতে নির্দেশ দেয়।

৮. ২৭.০৯.২০১০ বিবাদী নং ১ আরেকটি হলফনামা উপস্থাপন করে এই মর্মে যে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের বিরুদ্ধে একটি বিভাগীয় তদন্ত সংঘটিত হয়েছিল এবং তিনি পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতারও হয়েছিলেন এবং তখনও তদন্ত চলছিল।

৯. ২৬.০৯.২০১০ তারিখে বিবাদী নং ১৬ বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ২৩.০৯.২০১০ তারিখের একটি পত্র সম্বলিত একটি এফিডেভিট উপস্থাপন করেন যা ছিল সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসা সমূহের চেয়ারম্যানকে উদ্দেশ্যে করে লেখা। এই আবেদনে উল্লেখিত রুলের আলোকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্ট্রারকে এই বিষয়ে জানাতে এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বেসরকারী মাদ্রাসা শিক্ষকদের পেশা সংক্রান্ত শর্ত ও যোগ্যতা বিষয়ক নীতিমালা, ১৯৭৯ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে মাদ্রাসা সমূহের চেয়ারম্যানকে নির্দেশ দেয়। এই বিবাদী পরবর্তীতে রীট আবেদনের সাথে ৫.১০.২০১০ তারিখের আরেকটি পত্রের কপি সংযুক্ত করেন, যা ছিল মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যানের। যেখানে বলা হয়েছে যে, এইসব অভিযোগের ভিত্তিতে তিনি তদন্ত শুরু করবেন।

১০. ২৬.০৯.২০১০ইং তারিখে আবেদনকারী আরেকটি সম্পূরক হলফনামা দাখিল করেন এই মর্মে যে, এরকম আরও একটি ঘটনা ঘটেছে ২৬.০৯.২০১১ইং তারিখে ধানমন্ডির একটি স্কুলে, যেখানে নবম শ্রেণীর একটি ছাত্রকে পুরো ক্লাসের সামনে স্যান্ডেল দিয়ে মারা হয়েছিল।

১১. ২৮.০৯.২০১০ইং তারিখে আবেদনকারীরা আমাদের দৃষ্টিতে আরেকটি ঘটনা আনেন যা সংঘটিত হয়েছে ২৭.০৯.২০১০ তারিখে। একই দিনে কোর্ট বিবাদী নং ১ থেকে ৪কে সংবাদপত্রে উল্লেখিত বিষয়ের উপর তদন্ত করতে এবং প্রাপ্ত ফলাফল কোর্টকে জানাতে নির্দেশ দেন। আদালত মতামত দেন যে, এই ধরনের কার্যক্রম অবশ্যই স্কুল পরিদর্শক কর্তৃক পরীক্ষিত হতে হবে এবং বিশেষভাবে স্কুলে মাঝে মাঝে অঘোষিত পরিদর্শনও করতে হবে। আদালত বলেন স্কুল পরিদর্শনের অর্থ শুধু স্কুলে শিক্ষাগত অর্জন দেখাই নয় বরং একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও সহায়ক শিক্ষাদানের পরিবেশ সৃষ্টিও এর লক্ষ্য হবে।

১২. ২৫.১০.২০১০ তারিখে বিবাদী নং ১ শারীরিক শাস্তি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি খসড়া দিক নির্দেশনা সম্বলিত সম্পূরক এফিডেভিট উপস্থাপন করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে কি ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে এবং কি ধরনের ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব নয় এ বিষয়গুলো নির্ণয় করা। আমরা এখানে চিন্তা করছি যে, স্কুলে কোনরকম বিশৃঙ্খলা বা অনিয়মের জন্য কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া যাবে কিনা, আর যদি যায় তা কি ধরনের। আমরা আরও লক্ষ্য করছি যে, এই দিকনির্দেশনার প্যারা ৬ অপরাধী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে "সরকারী কর্মচারী আচরণবিধি ১৯৭৯" এবং "সরকারী কর্মচারী আচরণবিধি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫"এবং যেসব ক্ষেত্রে এই দুটো আইনের আওতায় পড়ে না, সেক্ষেত্রে "শিশু আইন ১৯৭৪", বাংলাদেশ দণ্ডবিধি এবং"নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০" এই আইনগুলো অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলে। যাই হোক, আমরা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছি যে, কোনো শিক্ষার্থীর উপর আরোপ করা শারীরিক শাস্তির ঘটনা কিভাবে নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ২০০০ এর বিধির মধ্যে আনা যায়।

১৩. ০৮.১১.২০১০ তারিখ বিবাদী নং ১৬, সংশ্লিষ্ট অফিসার কর্তৃক তদন্তের ভিত্তিতে গৃহীত কিছু ব্যবস্থার সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে রীট আবেদনে একটি হলফনামা দাখিল করে।

১৪. ৯.১১.২০১০ তারিখে বিবাদী নং ১ কিছু শারীরিক শাস্তির ঘটনা সংযুক্ত করে অপর একটি এফিডেফিট দাখিল করে যেখানে রীট পিটিশনে উল্লেখিত কতিপয় শারীরিক শাস্তির ঘটনা সম্পর্কিত প্রতিবেদন সংযুক্ত ছিল। এছাড়া "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদান নিষিদ্ধকরণ নীতিমালা ২০১০" সংযুক্ত করা হয়। এটিই সর্বশেষ খসড়া। আমরা ঐ ঘটনাগুলো সংশ্লিষ্ট বিবাদীদের দ্বারা দাখিলকৃত বিভিন্ন তদন্ত সংশ্লিষ্ট হলফনামা পেয়েছি। আমরা জনাব সফিউল ইসলামের সাথে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম যিনি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিদপ্তরের সহকারী নির্দেশক ছিলেন এবং তারও পূর্বে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের স্কুল পরিদর্শক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকভাবে মন্ত্রণালয়, পরিদপ্তর, শিক্ষাবোর্ড এবং তাদের স্থানীয় ও আঞ্চলিক অফিসগুলোর (যেমন: শিক্ষা মন্ত্রণালয়, যার একটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিদপ্তর রয়েছে, যার অধীনে ৬৪টি জেলার জেলা শিক্ষা অফিসার সমন্বয়ে গঠিত ০৯টি আঞ্চলিক অফিস রয়েছে এবং প্রত্যেকটি উপজেলায় উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার রয়েছে) বিস্তারিত বিবরণ প্রদানপূর্বক তাদের গঠন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় যার ০৬টি জেলায় ০৬ জন ডেপুটি ডিরেক্টরসহ একটি প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তর আছে, ৬৪টি জেলার ৬৪ জন জেলা শিক্ষা অফিসার এবং প্রত্যেক উপজেলায় সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তিনি আমাদের বলেন যে, সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার পরিদর্শক হিসেবে কাজ করেন। মোট নয়টি বোর্ড রয়েছে যার তিনটি ঢাকায় এবং যেগুলো মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা ও এদের পাঠ্যসূচী সংক্রান্ত বিষয়গুলি নির্ধারণ করে। তিনি আরও বলেন যে, একটি কলেজ পরিদর্শক বিভাগ ও একটি স্কুল পরিদর্শক বিভাগ আছে। স্কুল পরিদর্শক বিভাগে আছে স্কুল পরিদর্শক, ডেপুটি স্কুল পরিদর্শক এবং সহকারী স্কুল পরিদর্শক, যারা মূলত স্কুলসমূহের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশেষত স্কুলসমূহ অনুমোদিত কিনা এবং তাদের শিক্ষাগত মান ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয়গুলোর তত্ত্বাবধান করে। পরিদর্শকগণ প্রথমে শিক্ষা বোর্ডে এ সম্পর্কিত প্রাতবেদন দেন যা পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যায়।

তখন তিনি আমাদের বলেন যে, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড মূলত ঢাকার স্থানীয় এবং ৫ম শ্রেণী ও সমমান এবং তার পরবর্তী শ্রেণীগুলোর শিক্ষার্থীদের বিষয়গুলোর তত্ত্বাবধান করে এবং এর নয়টি আঞ্চলিক অফিস রয়েছে। উপরন্তু তাদের "ইকতিদাই" বিভাগ আছে যা মূলত প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বিষয়গুলোর তত্ত্বাবধান করে। পরিশেষে তিনি আমাদের বলেন যে, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষকদের পেশা সংক্রান্ত শর্তসমূহ 'মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবিধি - ১৯৬১' দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকুরীর শর্তসমূহ 'সরকারী চাকুরীবিধি' দ্বারা নির্ধারিত হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য আলাদা কোন আইন নেই।

১৫. রীট আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী সারা হোসেন বলেন, যদিও কোন আইনই শারীরিক শাস্তি সমর্থন করেনা কিন্তু দুঃখজনকভাবে সারা দেশের স্কুল ও মাদ্রাসায় শারীরিক শাস্তি প্রদান করা হচ্ছে, যা এক ধরনের রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতা, কারণ বারবার মারাত্মক সব শারীরিক শাস্তির ঘটনা ঘটলেও রাষ্ট্র যথাযথ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি। তিনি আরও বলেন যদিও দশটি শিক্ষা বোর্ডকে এই রীটে পক্ষভুক্ত করা হয়েছে তথাপি মাত্র দুটি বোর্ড রুলের জবাব দিয়েছে এবং ৫ ও ৬ নং বিবাদী/ প্রতিবাদী যারা তদন্ত নিশ্চিতকরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত তারা এই রুলের জবাব দেয়নি। তিনি বলেন যদিও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের আচরণের জন্য ১৯৬১ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধ্যাদেশ এবং ১৯৭৮ সালের মাদ্রাসা শিক্ষা অধ্যাদেশ রয়েছে কিন্তু সেখানে কোথাও ছাত্রদের শৃঙ্খলা সম্বন্ধে কিছু বলা নেই। ১৯৬১ সালের অধ্যাদেশের ১৯৬৬ সালের প্রবিধানের ৩৯(২) ধারায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ ও ডিগ্রী কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক শাখার ছাত্রদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার বিধান রয়েছে। প্রবিধান অনুযায়ী কোন ছাত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হলে বা শাস্তি দিতে হলে প্রধান শিক্ষক তা করতে পারবেন। কিন্তু বিষয়টি অধিক গুরুত্বসম্পন্ন হলেও অধিক শাস্তির বিষয় জড়িত থাকলে তা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে অবহিত করতে হবে ও তার রায় পাওয়া পযন্ত অপেক্ষা করতে হবে। শাস্তি হিসেবে কাজ করতে দেয়া যাবে, আটক রাখা যাবে, জরিমানা করা যাবে, ছাত্রত্ব স্থগিত করা যাবে, বহিষ্কার করা যাবে বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি দেয়া যাবে। প্রবিধান অনুযায়ী শাস্তিটি কোনক্রমেই অমানবিক হবে না। শ্রেনীকক্ষে আটক রাখার চেয়ে কখনো কখনো কোন ছাত্রের জন্য মুক্ত বাতাসে থাকাও শাস্তি হতে পারে। যখন সম্ভব হবে তখন অপরাধী ছাত্রকে দিয়ে কোন প্রয়োজনীয় কাজ করানোও শাস্তি হতে পারে। সারা হোসেন আরো বলেন, বেসরকারি বিদ্যালয়ের জন্য ১৯৬২ সালের একটি পৃথক আইন রয়েছে, কিন্তু সেখানে বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ আচরণ নিয়ে কিছু বলা নেই। আরো মজার ব্যাপার হলো সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের আচরণ নিয়েও কিছুই বলা নেই।

১৬. সারা হোসেন উপস্থাপন করেন এমন অনেক কাজ রয়েছে যার জন্য শিশুদের শাস্তি দেয়া হয়, সেগুলি আসলে আইনানুযায়ী কোন অপরাধই নয়। তিনি বলেন বরং শৃঙ্খলা রক্ষা ও নিয়ন্ত্রণের নামে যে সমস্ত শাস্তি দেয়া হয় সে শাস্তিগুলোই কখনো কখনো ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি, ১৯৭৪ সালের শিশু আইন ও ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনানুযায়ী অপরাধ।

১৭. শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত নীতিমালা জারীর পর বিজ্ঞ আইনজীবী মন্ত্রণালয় কর্তৃক দ্রুত রুল অনুযায়ী প্রথমে সার্কুলার ও পরে নীতিমালা জারী করাকে স্বাগত জানালেও তিনি আশংকা প্রকাশ করেন যে, দেশের প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই নীতিমালা জারী হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করার কোন ব্যবস্থা নেই। তিনি ১৯৬১ সালের অধ্যাদেশের ৩৯ ধারা সংশোধন করে নীতিমালাটি বাস্তবায়নের জন্য দ্রুত প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নীতিমালার একটি কপি প্রেরণের প্রস্তাব করেন।

১৮. বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, শারীরিক শাস্তির বিষয়টি অনুমোদনযোগ্য নয়, ১৯৬১ সালের অধ্যাদেশেও বিষয়টি নেই কিন্তু প্রবিধানের ৩৯(২) ধারায় ছাত্রদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গ ও অসদাচরণের জন্য শাস্তির কথা বলা আছে। তিনি বলেন ১৯৬১ সালের অধ্যাদেশে শাস্তির কথা বলা নেই এবং প্রবিধানেও শাস্তির কিছু প্রাথমিক নমুনা বর্ণিত আছে - যা একবারেই শেষ ব্যবস্থা হিসেবে বর্ণিত।

১৯. বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, বাংলাদেশের স্কুলসমূহে সাধারণত শারীরিক শাস্তি প্রদান করা হয় নীতিমালার ভিত্তিতে যদিও প্রচলিত বিধিমালায় শিশুদের উপর শারীরিক শাস্তি প্রদান নিষিদ্ধ। বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন, দণ্ডবিধির ৮৯ ধারার ব্যাখ্যা ও উদাহরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এটি নির্দিষ্টভাবে শিশুর যত্নের সঙ্গে জড়িত এবং এটি তাদের জন্য রক্ষাকবচ, কিন্তু কোনক্রমেই শিশুকে শাস্তি দেবার সম্মতি নাই। তিনি বলেন শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের অধীন একাধিক বিভাগ রয়েছে যারা শারীরিক শাস্তির বিষয়টি পরিদর্শন করতে পারেন এবং তাদের বিষয়টি পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব দেয়া দেতে পারে। তিনি বলেন শিশুদের মানুষ হিসেবে নিজস্ব মানবাধিকার রয়েছে এবং শৃঙ্খলার নামে তাদের ওপর কোন ধরনের অত্যাচার মেনে নেয়া যায় না। তিনি বলেন যে কোন মানুষের বিরুদ্ধে যে কোন ধরনের আঘাত, তা যত ছোটই হোক না কেন একটি ফৌজদারী অপরাধ; সেখানে শৃঙ্খলার নামে শিশুদের বিরুদ্ধে শারীরিক শাস্তি মারাত্মক হিসেবে নেয়া হচ্ছে না, এর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না বা কোন শাস্তিও আরোপ করা হচ্ছে না। অপর দিকে শৃঙ্খলা রক্ষার নামে শারীরিক শাস্তি বৈধতা পাচ্ছে। আপাতভাবে এটা মনে হতে পারে যে, অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর সময় এ বিষয়ে সম্মতি দেন, কিন্তু এটি কোন অভিভাবকের বিষয় নয়; কারণ অবমাননাকর, যন্ত্রণাদায়ক মানসিক ও শারীরিক শাস্তি ভোগ করে শিশুটি। তিনি বলেন শারীরিক শাস্তির যে বিষয়গুলো উঠে আসে তাও স্থানীয়ভাবে সালিশ হয় কিন্তু এটি ঠিক নয়; কারণ এমন বিষয়ের জন্য শিশুটি শাস্তি পাচ্ছে যা আসলে অপরাধই নয়। তিনি বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) বনাম বাংলাদেশ সরকার ও অন্যন্য (রীট পিটিশন নং ৫৮৬৩/২০০৯) মামলার রায়ের কথা উল্লেখ করেন। ০৮.০৭.২০১০ তারিখে প্রদান করা রায়ে বলা হয়েছে কোন অপরাধের বিচার শুধুমাত্র আদালত অথবা ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে করা যেতে পারে এবং প্রথাগত বা বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি শুধুমাত্র আইন অনুসারে করা যেতে পারে এবং বাংলাদেশের আইনে অপরাধ হিসেবে উল্লেখ নেই এমন কোন ঘটনার জন্য শাস্তি দেয়া যেতে পারে না। আদালত বলেছিলেন সালিসের মাধ্যমে প্রথাগত বিরোধ নিস্পত্তি প্রক্রিয়া সরকার যথাযথ পদক্ষেপ নেবেন যেন জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় যে, বিচার বহির্ভূত সাজা আইন বহির্ভূত এবং একটি অপরাধ। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, মাননীয় বিচারপতিগণ সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন যে, "বিচার বহির্ভূত সাজা অসাংবিধানিক এবং আইন অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য।" পারিবারিক বিরোধের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় কিন্তু যেকোন ধরণের বিচার বহির্ভূত শাস্তি যেমন বেত্রাঘাত দ্বারা কোন ব্যক্তি সালিসের মাধ্যমে আরোপ করা অসাংবিধানিক।

বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন খুবই তুচ্ছ ঘটনা যেমন চুল বড় রাখা, বাড়ীর কাজ না করা, রং পেন্সিল না আনা, নামায না পড়া, এসব বিষয়ে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে যা রীট আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো কোনটি ফৌজদারী অপরাধ নয় কিন্তু তারপরও তাদেরকে শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে এমন পর্যায়ে যে তাদের চিকিৎসার প্রয়োজন হয়েছে এবং কেউ কেউ ডিপ্রেশনে আক্রান্ত হয়েছে এমনকি আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটেছে। ২৬.০৯.২০১০ তারিখে বাদীপক্ষ একটি হলফনামা দায়ের করেন যেখানে বলা হয় শারীরিক শাস্তির ফলে শুধু শিশুদের শরীরের উপরই না মনের উপরও স্থায়ী চাপ পড়ে। শারীরিক শাস্তির পাশাপাশি মানসিক শাস্তি শিশুর সুস্থ সবল নাগরিক হিসেবে বেড়ে উঠতে বাধা প্রদান করে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ মেডিকেল এবং ডেন্টাল কাউন্সিল এখন পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা নেয়নি শারীরিক শাস্তি বা শিশুদের উপর শারীরিক শাস্তি সম্পর্কে।

২০. সারা হোসেন পরবর্তীতে বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা বিষয়ক পদক্ষপে নেবার ব্যাপারে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, সংশ্লিষ্ট বোর্ডের অধীন বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার নিবন্ধন বিষয়ে পরিদর্শনের কর্তৃত্ব বোর্ডগুলোর রয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি তার চাকরির পরিপন্থী কোন কাজ করেন তবে তার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য ব্যবস্থা নেয়া যাবে ও তাকে তার পদ থেকে অপসারণ করা যাবে। যদিও শারীরিক শাস্তি প্রদানের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য ব্যবস্থা নেয়া যায় না। প্রবিধানে শিক্ষকদের কী কী কাজ অসাদচরণ বলে গণ্য হবে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকলেও শারীরিক শাস্তি প্রদানকে তার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বিজ্ঞ আইনজীবী শারীরিক শাস্তি প্রদানকে পেশাগত অসাদচরণের অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেন।

২১. মিস হোসেন উল্লেখ করেন যে, একটি আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে বাংলাদেশ বাধ্য শারীরিক শাস্তি নিরোধ করতে এবং শিশুদের জন্য কার্যকর প্রতিরামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। তিনি আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের মূলনীতিসমূহ দাখিল করেন, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তির মনুষ্যত্বের মর্যাদা, শারীরিক অক্ষুন্নতা এবং সমঅধিকার প্রাপ্ত হয়েছে। বাংলাদেশ শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সনদ ১৯৬৬, নির্যাতন ও সকল প্রকার নিষ্ঠুর ও অমানবিক শাস্তি ও আচরণের নিষিদ্ধকরণ সনদে নির্দিষ্ট ভাবে শিশুদের প্রতি সকল প্রকার শারীরিক শাস্তিকে শারীরিকভাবে ক্ষতিকর এবং শিশুদের নিষ্ঠুর ও অমানবিক নির্যাতন থেকে মুক্তি পাওয়ার অধিকার এবং আইনের আশ্রয়লাভের সমানাধিকারের পরিপন্থী। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, শিশু অধিকার সনদের সাধারণ মন্তব্য ৮ অনুযায়ী সকল প্রকার শারীরিক শাস্তি শিশু অধিকার সনদের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ২০০৯ এর শিশু অধিকার সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ কমিটি বাংলাদেশের প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে মন্তব্য করেছেন যে, শারীরিক শাস্তি রোধে আইনগুলোর অকার্যকর প্রয়োগ সম্পর্কে এবং স্কুলগুলোর শারীরিক শাস্তি সমর্থন করে যে নীতি আছে সে ব্যাপারে তারা উদ্বিগ্ন। কমিটি আরও উদ্বেগ প্রকাশ করেন যে, সংবিধানে নিষ্ঠুর, অমানুষিক এবং লাঞ্ছনাকর কোন আচরণকে নিষিদ্ধ করলেও শিশুদের উপর শারীরিক শাস্তির ঘটনা ঘটছে যেহেতু আইনে এবং সমাজে তা স্বীকৃত। এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য কমিটি কিছু সুপারিশ করেছে।

২২. বিবাদীর পক্ষে মোঃ মোতাহার হোসেন, বিজ্ঞ সহকারী এটর্নি জেনারেল প্রকৃতপক্ষে উক্ত রুলটির বিরোধিতা করেননি । তিনি তদন্ত প্রতিবেদন সরবরাহ করেছেন এবং মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে সময়মতো আমাদের অবগত করেছেন। স্বাভাবিকভাবে তিনও স্কুল এবং মাদ্রাসায় শারীরিক শাস্তির পক্ষে নন। তিনি উল্লেখ করেছেন সরকারী বিজ্ঞপ্তি এবং নির্দেশনা প্রকাশিত হয়েছে এবং তা সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সরবরাহ করা হয়েছে। তিনি যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন, প্রয়োজনে বিজ্ঞপ্তিটিকে ১৯৬৬ সালের বিধিমালার সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে। তিনি আরও জানিয়েছেন, প্রচারণার বিষয়টি সংবাদপত্র ছাড়াও টেলিভিশনে প্রচার করা হয়েছে। কমিটির প্রস্তাবনার আলোকে (সংযুক্তি - ৬) এর বিষয়টি প্রচারের জন্য সংবাদপত্র এমনকি রেডিও এবং ইউনিসেফকে অনুরোধ জানানো হয়েছে জনসচেতনতার জন্য টেলিভিশনে এবং জনসাধারণের কাছে পোস্টার লিফলেটও বিতরণ করতে।

২৩. আমরা বিজ্ঞ আইনজীবীর উপস্থাপনা এবং দুই পক্ষের সরবরাহকৃত কাগজসমূহ মনোযোগের সাথে বিবেচনা করছি। রিট পিটিশনটির বিষয় এবং অতিরিক্ত হলফনামা যা পক্ষসমূহ দাখিল করেছে, এ থেকে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার এক অন্ধকার এবং পঙ্কীল দিক উন্মোচিত হয়েছে। কিছু ঘটনার বর্ণনা আমাদের বিবেককে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে এবং বেদনার সাথে লক্ষ্য করতে হয়েছে কিভাবে শিশুদের সামান্য ত্রুটির জন্য কিছু অভিভাবক তাদের সন্তানদের শিক্ষক কর্তৃক নির্দয় প্রহারকে সমর্থন করতে পারেন । সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এটি যে, নির্যাতনের ঘটনায় মৃত্যুও হয়েছে। এখন আমাদের ভাববার সময় এসেছে শৃঙ্খলা শেখানোর নামে শিশুদের সাথে কি করা হচ্ছে।

শারীরিক শাস্তি কী ?

২৪.সাধারণভাবে শারীরিক শাস্তি বলতে শৃঙ্খলার নামে দৈহিক আঘাত করাকে বুঝায়। সারা পৃথিবীতেই পরিবার প্রথার সময় থেকে শৃঙ্খলার নামে শারীরিক নির্যাতন হয়ে আসছে। শিশুদের উপর শারীরিক নির্যাতন দৈহিক আঘাতসহ (করাঘাত, থাপ্পড়, চড়) হতে পারে। এটি খালি হাতে হতে পারে আবার চাবুক, বেল্ট, বেত, জুতা ইত্যাদি দিয়ে আঘাতও হতে পারে। আবার লাথি, জোরে ঝাঁকি দেয়া, ছুঁড়ে ফেলা, আঁচড়ে দেয়া, পেটানো, চুল টানা, কানটানা, শিশুদের পীড়াদায়ক ভঙ্গিতে থাকতে বাধ্য করা, পুড়িয়ে দেয়া, গরম তরল পদার্থ ঢেলে দেয়া (যেমন, শিশুদের মুখে সাবান অথবা জোর করে ঝাল জাতীয় মশলা দেয়া) ইত্যাদিও হতে পারে। এখানে উল্লেখ্য, দৈহিক নয় এমন শাস্তিও অন্তর্ভুক্ত যেমন, মর্যাদাহানিকর কিছু করা, মিথ্যা অপবাদ দেয়া, একজনের কারণে অন্যকে অভিযুক্ত করা, হুমকি দেয়া, ভয় দেখানো ইত্যাদি। অভিভাবকেরা শিশুদের যেসব আচরণ পছন্দ করেন না সে সবের জন্য তারা তিরস্কার করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে, শিশুরা তাদের চাইতে বয়সে আকৃতিতে বড় সকলের কাছেই শৃঙ্খলা শেখার নামে নির্যাতনের শিকার হয়। শিশুদের উপর শারীরিক শাস্তি যুগযুগ ধরে হয়ে আসছে এবং অভিভাবক ও শিক্ষকের কাছে এটি নিত্যকার ঘটনা। এটি বলা যেতে পারে শারীরিক শাস্তি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসছে এবং এটি একটি রীতি। সর্বোপরি , কিছু প্রাপ্তবয়স্ক এবং অভিভাবকরেদের এটি বদ্ধমূল ধারণা শারীরিক শাস্তিই শিশুদের শিক্ষা দেবার একমাত্র পথ এবং এটি স্বাভাবিক যেহেতু তারা নিজেরাও এ আচরণের শিকার হয়েছিল। আবার অনেকে বাড়িয়ে বলেন যে, যদি শাস্তি না থাকতো তবে তারা আজকের পর্যায়ে আসতেন না।

২৫. আমাদের নিকট উপস্থাপিত স্বাক্ষ্য প্রমাণাদি দ্বারা আমরা লক্ষ্য করেছি, শারীরিক শাস্তির সহিংসেতা যা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবহার দ্বারা বা বিভিন্ন আকারের বা বিভিন্ন ক্ষতিকর বস্তুর ব্যবহার দ্বারা প্রয়োগ করা হয়। অপরপক্ষে, শারীরিক শাস্তি শিশুর শারীরিক অবস্থা ও মানসিক মূল্যবোধের উপর বিভিন্ন রকম ও বিভিন্ন প্রকার প্রভাব ফেলে। শারীরিক শাস্তির ফলে শিশুর উপর মানসিক প্রভাব সৃষ্টি হয় যা বাইরে থেকে দেখা যায় না কিন্তু শারীরিক প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট যার ফলে শিশুকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয় আবার কখনো কখনো শিশুর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে থাকে। তাছাড়া ধারাবাহিকভাবে কোন শিশুকে তিরস্কার করলে সে আত্মহত্যাও করতে পারে।

২৬. শিশু অধিকার সনদের ১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী,

১৯.১ অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্র, পিতা-মাতা আইনানুগ অভিভাবক বা শিশু পরিচর্যায় নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে থাকা অবস্থায় শিশুকে আঘাত বা অত্যাচার, অবহেলা বা অমনোযোগী আচরণ, দুর্ব্যবহার বা শোষণ এবং যৌন অত্যাচারসহ সব রকমের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন থেকে রক্ষার জন্য যথাযথ আইনানুগ, প্রশাসনিক, সামাজিক এবং শিক্ষাগত ব্যবস্থা নেবে।

২. শিশুর সুরক্ষিত পরিচর্যা যথাযথ বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য শিশুর পরিচর্যা নিয়োজিতদের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়ার জন্য সামাজিক কর্মসূচী প্রবর্তনের ব্যবস্থা নেবে এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং শিশু নির্যাতনের উল্লেখিত ঘটনার ক্ষেত্রে চিহ্নিত করা, রিপোর্ট করা, দায়িত্ব প্রদান, তদন্ত, চিকিৎসা এবং পর্যবেক্ষণসহ প্রয়োজনে বিচার বিভাগের ব্যবস্থা নিতে হবে।

এ প্রসঙ্গে অনুচ্ছেদ ২৮.২ এর বিধান অনুসরণযোগ্য-

সদস্য রাষ্ট্রসমূহ শিশুদের আত্মমর্যাদা ও এই বিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিদ্যালয়-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করবেন।

২৭. শিশু অধিকার সনদের অনুচ্ছেদ ৩৭ অনুযায়ী প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র অবশ্যই নিশ্চিত করবেন যে, শিশুরা কখনই নিষ্ঠুরতা, অমানুষিক ও অপমানজনক আচরণের শিকার হবে না।

শিশু অধিকার সনদের ০২.০৩.২০০৭ তারিখে জারিকৃত সাধারণ মতামত নং ০৮, শারীরিক শাস্তি এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর ও অপমানজনক শাস্তির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এ উদ্দেশ্যে যে, সদস্য রাষ্ট্রসমূহ যেন অবশ্যই সকল প্রকার নিষ্ঠুর ও অপমানকর শারীরিক শাস্তি বিলোপ করতে প্রয়োজনীয় আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কমিটি এই মতামত প্রকাশ করে যে শারীরিক শাস্তি প্রদান প্রথাটি শিশুদের আত্ম মর্যাদা ও সম অধিকারের যে অধিকার রয়েছে তার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। আমাদের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৫ নাগরিকের বিচার ও দন্ড সম্পর্কীয় অধিকার সুনিশ্চিত করেছে। বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৫ (৫) অনুযায়ী, কোন ব্যক্তিকে নির্যাতন করা যাবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দন্ড দেয়া যাবে না কিংবা কারও সাথে অনুরূপ ব্যবহার করা যাবে না।

২৮. ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত "ইন্টিগ্রেটেড ইনফরমেশান নেটওয়ার্ক (আইআরআইএন)" এর ২০০৯ এর ৩ নভেম্বর প্রকাশিত তথ্যাবলী ইউনিসেফের একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করে যাতে দেখা যায় বাংলাদেশের বেশীরভাগ শিশুই বিদ্যালয়, নিজগৃহে এবং কর্মক্ষেত্রে নির্যাতিত হচ্ছে।

- "প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, ৯১% শিশুরা বিদ্যালয়ে এবং ৭৪% শিশুরা গৃহে কোন ধরণের শারীরিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।"

- "শারীরিক শাস্তির এই ভীতিই শিশুকে বিদ্যালয় থেকে পালানো বা পড়াশোনার প্রতি মনোযোগ হারিয়ে ফেলার অন্যতম কারণ এবং মাত্র ৭৫% স্কুলে তালিকাভুক্ত শিশু নিয়মিত স্কুলে যায়।"

যেসব শিশুরা শিশুশ্রমের সাথে জড়িত সেসব শিশুরা প্রচন্ড কাজের চাপ, ন্যূনতম মজুরী এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজ ছাড়াও বিভিন্ন রকেম শারীরিক শাস্তির শিকার হচ্ছে-তাদের এক চতুর্থাংশ নিয়মিত প্রহারের শিকার হয়, ৬৫% কোন না কোনভাবে তাদের কর্মক্ষেত্রে নির্যাতিত হয়।

- "উক্ত জরিপের ফলাফল অনুযায়ী ৯৯.৩% শিশুরা তাদের অভিভাবক দ্বারা মৌখিকভাবে প্রচন্ড ভর্ৎসনার শিকার হচ্ছে। ৭০% শিশুদের শাস্তি প্রদানের একটি সাধারণ উপায়ই হল, চড় - থাপ্পড় এবং ৪০% শিশুরা প্রতিনিয়ত প্রহার ও লাথির শিকার হচ্ছে।"

শারীরিক শাস্তির ক্ষতিকর দিক

২৯. এ কথা অনস্বীকার্য যে, শারীরিক শাস্তি শিশুর শারীরিক, মানসিক বৃদ্ধির পথে অন্তরায়। এটা শিশুকে স্কুলের প্রতি অনাগ্রহী করে তোলে যা অশিক্ষা ও দারিদ্রের কারণ হয়ে দাড়ায়।

৩০. শারীরিক শাস্তি বন্ধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক যে পরিপত্রটি জারি করা হয়েছে আমরা তার প্রতি সমর্থন জানাচ্ছি। আমরা দৃঢ়ভাবে সুপারিশ করছি যে, এই সচেতনতামূলক কর্মকান্ডটি যেন চলে। শিক্ষকদের চাকুরী বিধিমালায় শারীরিক শাস্তির বিষয়টিকে অসদাচরণ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হোক যেন কোন শিক্ষক কোন ছাত্র ছাত্রীকে শারীরিক শাস্তি প্রদান করলে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। এই অনুযায়ী আইন সংশোধন করা যায়।

৩১. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ বিষয় নিশ্চিত করবে যে, যারাই শিশুদের সংস্পর্শে আসবে তারা উপলব্ধি করবে যে, শারীরিক শাস্তি শিশুর জন্য ক্ষতিকর। কেউ এর ব্যতিক্রম করলে চাকুরি বিধানুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবার পাশাপাশি প্রচলিত আইনানুযায়ী ফৌজদারী ব্যবস্থাও নেয়া হবে।

৩২. মামলার রীট পিটিশনে শারীরিক শাস্তির শিকার শিশুদের শারীরিক ক্ষতির দিকটি তুলে ধরা হয়। আমরা লক্ষ্য করেছি কোন কোন ক্ষেত্রে এসব শিশুদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়নি। শারীরিক শাস্তি শিশুর আবেগকেও প্রভাবিত করে। যখন কোন শিশু স্কুলে শাস্তি পাবে তখন সে বিদ্যালয়ে যেতে চাইবে না। এটা অবশ্যই শিশুদের উন্নয়নে এবং দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়তে ভয়ানক প্রভাব ফেলবে। উপরন্তু আমরা দেখেছি শিশুরা আত্মহননের পথ বেছে নেয়। নিঃসন্দেহে এটি অপ্রত্যাশিত এবং অপুরণীয় ক্ষতি।

৩৩. আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দিল্লী হাইকোর্টের একটি সিদ্ধান্তের উপর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন "Parents Forum for Meaningful Education and Another VS. Union of India and another, AIR ২০০১(Delhi) ২১২" এই মামলাটি দিল্লী স্কুল শিক্ষাবিধি ৩৭(১)(K) (ii) এবং (iv) সংক্রান্ত যেটি শিক্ষকদের শাস্তি আরোপ করার ক্ষমতা দিয়েছেন। উপরের রুলের উপর গুরুত্ব আরোপ করে, দিল্লী হাইকোর্টের একটি ডিভিশনাল বেঞ্চ জাতীয় আইন এবং শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত সনদ (সি.আর.সি) প্রকাশ করেন, যা নিম্নরূপ:

> ২০."শিশুদের সমঝোতা, শান্তি এবং ধৈর্য্যশীলতার উপর ভিত্তি করে একটি দায়িত্বশীল সমাজের জন্য গড়ে তুলতে হবে। আমরা শিশুদের মানসিক ও শারীরিক অত্যাচারের বিষয়বস্তু করতে পারি না এবং তাদের কাছ থেকে এখনও অপরের প্রতি বোধবুদ্ধি, শান্তি ও ধৈর্য্য সহকারে কাজ করা আশা করি এবং শান্তি ও ভালবাসার নায়ক হিসেবে দেখতে চাই। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, আমরা যদি সত্যিই শান্তির পৃথিবী তৈরী করতে চাই এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাই, তাহলে শিশুদের দিয়েই শুরু করতে হবে কিন্তু আমাদের ভালোবাসা ও শান্তির সাথে অগ্রসর হতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত পুরো পৃথিবী শান্তিতে পূর্ণ না হয়।"
>
> ২১.শিশুরা প্রকৃতির মূল্যবান সম্পদ, তাই ভালোবাসা এবং সচেতনতার সাথে তাদের বেড়ে তোলা উচিত, নিষ্ঠুরতার সাথে নয়। নিষ্ঠুরতা তাদের শরীর ও মনের অপূরণীয় ক্ষতির সৃষ্টি করে। সুপ্রীম কোর্ট বলেন, জীবনকে উপভোগ করার প্রতিটি মাধ্যম বা ক্ষমতা অনুচ্ছেদ ২১ এ সুরক্ষিত। জীবন ধারণের স্বাধীনতার অধিকার শুধু তখনই লঙ্ঘিত হয় না যখন শরীরের উপর শাস্তি আরোপ করা হয় বরং তখনও হয় যখন একটি শিশুর উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা হয়। শিশুর উপর আতঙ্ক ও অত্যাচার সৃষ্টি করা যে কোনো রকমের সহিংসতামূলক কাজ যা তার মনের উপর প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, এর ফলে সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদ লঙ্ঘিত হয়। এ কথা বলতে যেয়ে আমরা শিশু অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশনের উপরেও দৃষ্টিপাত করছি, যেখানে স্পষ্ট করে বলা আছে যে, শিশুর উপর শারীরিক, মানসিক কোনো সহিংসতা, অত্যাচার, অমানবিক ও ক্ষতিকর আচরণ করা না হয় সেজন্য শিক্ষাগত, সামাজিক, আইনগত ও প্রশাসনিক সকল প্রকার পদক্ষেপ নিতে হবে এমনকি পিতামাতা, বৈধ অভিভাবক এবং অন্যান্যদের তত্ত্বাবধানে শিশুরা থাকলেও। "Parents Forum for Meaningful Education and Another VS. Another Vs. Union of India and another, AIR ২০০১(Delhi) ২১২" এই মামলাটির সিদ্ধান্ত "শিশু অধিকার সনদ"র উপর ভিত্তি করে গৃহিত যা উক্ত সনদেও অনুচ্ছেদ ২১, ২৩, ২৪, ৩৯(ঙ)ও(চ) এবং ৪৬ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে পড়তে হবে। এখানে আরও বলা আছে যে শিশুরা সমাজের দায়িত্বশীল ও কার্যকর সদস্য হিসেবে বেড়ে উঠতে পারবেনা যদি না সমাজ তাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সহযোগিতা না করে।

৩৪. উপরের মামলাটি থেকে আমরা দেখি যে, দেশের বর্তমান আদালতগুলো এবং উচ্চ আদালতগুলোও শারীরিক শাস্তিকে নিষেধ করেন।

৩৫. যতদূর পর্যন্ত আমরা দেখেছি বাংলাদেশের বর্তমান আইনগুলোতে বাসাবাড়ীতে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি সংক্রান্ত কোনো বিশেষ বিধান নেই। তবে দন্ডবিধি, ফৌজদারী কার্যবিধি, কারাবন্দী আইন ১৮৯৪, চাবুক আইন ১৯০৯, সেনানিবাস বিশুদ্ধ খাবার আইন ১৯৬৬, রেলওয়ে আইন ১৮৯০ এবং শিশু আইন ১৯৭৬ বিশেষ বিশেষ অপরাধের ক্ষেত্রে শারিরীক শাস্তি আরোপের বিধান রেখেছে। কিন্তু এগুলো স্কুল এবং বাড়ীতে শাস্তি প্রদান সংশ্লিষ্ট নয়।

৩৬. *গ্লোবাল ইনিশিয়াটিভ*, একটি আর্ন্তজাতিক সংস্থা কর্তৃক ২০০১ সালের একটি জরিপে দেখা যায় যে, দন্ডবিধির ৮৯ ধারা শারীরিক শাস্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা স্বরূপ। অর্থাৎ শারিরীক শাস্তি যেসব শিক্ষক ও অভিভাবক দ্বারা আরোপিত, সেগুলো আইন দ্বারা অনুমোদিত। দণ্ডবিধির অধ্যায় ৪ যেখানে সাধারণ ব্যতিক্রমগুলোর বর্ণনা দেয়া আছে, সেখানে কিছু কার্যের কথা বলা আছে, যা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে না। আমাদের মতে, ধারা ৮৯ ও ধারা ৯১ পরস্পর সম্পৃক্ত এবং তাদের একসাথে পড়তে হবে। ৮৯ এবং ৯১ ধারামতে,

> ধারা ৮৯:এমন কোনো কাজই অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে না, যা ১২ বছরের নিচের কোনো শিশুর মঙ্গলের জন্য সরল বিশ্বাসে করা হয় এবং যা সেই শিশুর অভিভাবক কর্তৃক আইনগত ক্ষমতাপ্রাপ্ত।
> তবে শর্ত থাকে যে,
> প্রথমত, এই ব্যতিক্রমটি অবশ্যই কোন শিশুর মৃত্যু ঘটানোর কারণ পর্যন্ত বিস্তৃত নয়।
> দ্বিতীয়ত, কোনো কার্য শিশুর মৃত্যু বা মারাত্মক আঘাত থেকে রক্ষার জন্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে করা হয় এবং যা দ্বারা শিশুর মৃত্যু ঘটার আশঙ্কা থাকে, সেসব ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম কার্যকর হবে না।
> তৃতীয়ত, যে ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি জানে যে, তার কার্য দ্বারা শিশুর মৃত্যু বা মারাত্মক জখম হতে পারে এবং সে কার্যটি যদি শিশুকে মৃত্যু বা মারাত্মক আঘাত থেকে উদ্ধার করার জন্য না হয়ে থাকে তবে সেই কার্য এই ব্যতিক্রমের আওতায় পড়বেনা।
> চর্তুথত, এই ব্যতিক্রম এমন কোন অপরাধ সংঘটনের জন্য প্রযোজ্য হবে না, যে অপরাধের সংঘটন এই ব্যতিক্রমের আওতায় পড়েনা।
>
> *উদাহরণ:*
>
> "ক" শিশুর মঙ্গলের জন্য শিশুর অজ্ঞাতে ডাক্তার দ্বারা শিশুর অপারেশন করায়, যার দ্বারা শিশুর মৃত্যুও সংগঠিত হতে পারতো। "ক" এই ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়বে যতক্ষণ পর্যন্ত তার উদ্দেশ্য থাকে শিশুকে আরোগ্য করা ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো অপরাধ সংঘটন হবে না।
> ধারা ৯১:অনুচ্ছেদ ৮৭, ৮৮ এবং ৮৯ র ব্যতিক্রমের আওতায় সেই সব কার্য আসবেনা, যার দ্বারা উক্ত ব্যক্তি যে সম্মতি দিচ্ছে বা যার পক্ষ থেকে সম্মতি দেয়া হচ্ছে, তার ক্ষতি হতে পারে বা ক্ষতির কারণ হতে পারে।

উদাহারণ:

গর্ভপাত ঘটানো স্বাধীনভাবে একটি অপরাধ (যদি না সরল বিশ্বাসে মহিলার জীবন বাঁচানোর জন্য করা না হয়ে থাকে) যদি তা মহিলার ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে।

৩৭. শারীরিক শাস্তি হলো একজন মানুষের দেহের উপর কোনো বস্তু যেমন চাবুক, লাঠি, স্কেল বা অন্য কিছু দিয়ে বা হাত পা বা শরীরের অন্য কোনো অঙ্গ দিয়ে ইচ্ছা মতো আঘাত করা। ধারা ৮৯র তৃতীয় উপধারার ব্যতিক্রম অনুযায়ী, এ ধারা কোন প্রকার ইচ্ছা মতো মারাত্মক শারীরিক আঘাত বা মারাত্মক শারীরিক আঘাতের চেষ্টাকে অর্ন্তভুক্ত করবে না যদি সেই আঘাত উক্ত ব্যক্তির মৃত্যু, মারাত্মক শারীরিক আঘাত ও মারাত্মক অসুস্থতা প্রতিহত করার জন্য হয়। অর্থাৎ কোনো শিক্ষক কাউকে মারাত্মকভাবে শারীরিক আঘাত করলে তা এই ব্যতিক্রমের অর্ন্তভুক্ত হবে না। অর্থাৎ ধারা ৯১ এ ব্যাপারটি পরিষ্কার যে, যদি কোনো আঘাত অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়, তাহলে সেটি এই ব্যতিক্রমের আওতায় পড়বে না এবং তা দণ্ডবিধির ৩২৩ ধারা অনুযায়ী একটি অপরাধ হবে। আমাদের মতে এই ধারা এবং এই অধ্যায়ের অন্য কিছু ধারা স্বাস্থ সেবা দিচ্ছেন এমন ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্কিত এবং এই কারণে দণ্ডবিধির চতুর্থ অধ্যায়ের এই ধারাগুলো শারীরিক শাস্তি বিষয়ক না।

৩৮. উপরন্ত, আমাদের মতে, যে সব যুক্তিবলে বিদ্যালয়ে পিতামাতা ও সন্তানের সম্মতিতেই শারীরিক শাস্তি দেয়া হচ্ছে সেসব যুক্তিগুলো ভ্রান্তিমূলক। কোন কোন স্কুলের লিখিত প্রসপেকটাসে এই বিষয়টির উল্লেখ থাকে যে, শিশুটি কখনো কখনো স্কুলের বিধি লঙ্ঘন সাপেক্ষে শারীরিক শাস্তির শিকার হতে পারে তার অর্থ এই না যে, শিশুটি বা তার অভিভাবক শারীরিক শাস্তি প্রদানের সম্মতি দিয়েছে।

৩৯. যাই হোক, বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার সংশ্লিষ্ট লিখিত আইনগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, "পূর্ব পাকিস্তানের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধ্যাদেশ, ১৯৬১"র ৩৯(২) ধারানুযায়ী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রী কলেজের শিক্ষার্থীকে শারীরিক শাস্তি দেয়া যাবে। এই বিধিটি প্রয়োজনীয় শাস্তি আরোপের অনুমোদন ও দিয়েছে, যদি কোনো শিশু বিশৃংখলা বা অবাধ্যতা করে, যদি অনেককে শাস্তি দেয়ার প্রয়োজন হয়, তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যানকে জানাবেন এবং চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা নিবেন না। এই বিধি অনুযায়ী যেসব শাস্তি দেয়া সম্ভব সেগুলো হলো: ১) শাস্তি হিসেবে কোনো কাজ করতে দেয়া, ২) আটক; যা অতিরিক্ত শারীরিক শিক্ষাকেও অর্ন্তভূক্ত করবে, ৩) জরিমানা, ৪) সাময়িক বরখাস্ত, ৫) বহিষ্কার ৬) অন্যান্য শাস্তি। অন্যান্য শাস্তির স্বরূপ সর্ম্পকে বিস্তারিত বিবরণ এই বিধিতে বলা আছে। যেমন:

" ৬) অন্যান্য শাস্তি

একজন শিক্ষক উপরে বর্ণিত শাস্তি সমূহ ব্যতীত "অন্যান্য শাস্তি" ও দিতে পারেন, যদি তার কাছে এসব শাস্তি ব্যতীত "অন্যান্য শাস্তি" প্রদানই বেশি উপযুক্ত মনে হয়। তবে অন্যান্য শাস্তি দেয়ার সময় নিচের বিষয়গুলো অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

ক) এই শাস্তি অবশ্যই নিষ্ঠুর হবে না।

খ) শ্রেণী কক্ষে শাস্তি দেয়ার চেয়ে খোলা বাতাসে দেয়াই ভালো।

গ) যদি সম্ভব হয় তাহলে শাস্তি হিসেবে কোনো প্রয়োজনীয় কাজ করতে দেয়া ভালো।

৪০. অর্থাৎ এখানে শারীরিক শাস্তি দেয়ার কথা বলা হচ্ছে না। লক্ষ্যায় যে, তুলনামূলকভাবে বেশী বয়সের শিশুদের মাধ্যমিক স্কুলে উপস্থিতির জন্য বিধি থাকলেও ছোট শিশুদের শারীরিক শাস্তি প্রদানের সমর্থনে কোন বিধি আমরা কল্পনা করতে পারি না। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নীতিমালাতেই শারীরিক শাস্তি প্রদানকে সমর্থন করে বলে আমাদের জানা নাই। এই নীতিমালার আওতায় আমরা বলতে পারি যে, একজন শিক্ষক যদি শারীরিক শাস্তি প্রদানের পুর্বে আপত্তি বা অনিচ্ছা প্রকাশ করে তাহলে তার এ আচরণ উক্ত বিষয়টি নিস্পত্তিতে যথেষ্ট। কোন কোন ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সতর্ক করাও সন্তোষজনক। অনেক সময় অপরাধী শিক্ষার্থীর নাম যদি আলাদাভাবে লিখে রাখা হয়, তবে এটিও অনেক কার্যকর হয়। তবে এ বিষয়টি পরিষ্কার যে,এই বিধির উদ্দেশ্য হলো অপরাধী শিক্ষার্থীকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে সর্বশেষ উপায়ই এবং শারিরীক শাস্তি প্রদান বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

৪১. আমরা মাদ্রসা শিক্ষা অধ্যাদেশ, ১৯৭৮, বেসরকারী স্কুল অধ্যাদেশ, ১৯৬২, পর্যালোচনা করেছি কিন্তু শারীরিক শাস্তি বিষয়ক কোন বিধান পাইনি। তারপরও বাংলাদেশের স্কুলগুলোতে শারীরিক শাস্তি আরোপের বিষয়গুলো খুব সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। রীট আবেদনে একটি ঘটনা খুব পরিষ্কার ভাবে সাক্ষ্য হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে, যেখান একজন শিক্ষক (বিবাদী নং ৪১) অষ্টম শ্রেণীর একজন শিক্ষার্থীকে এমনভাবে পিটিয়েছে যে, তাকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়েছিলো। বিবাদী নং ৩২ এর ক্ষেত্রে, বিবাদী অষ্টম শ্রেণীর একজন শিক্ষার্থীকে এমনভাবে পিটিয়েছে যে, তাকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়েছিলো, তার নামাজ আদায় না করার কারণে। হাসপাতালে তাকে ভর্তি থাকতে হয়েছিলো ৮ দিন। যদিও তার পিতার এ বিষয়ে কোনো অভিযোগ ছিলো না। তবে যেহেতু তারা দরিদ্র ছিলো তাই হাসপাতালের খরচ বহন করেছিলো মাদ্রাসার ঐ শিক্ষক এবং প্রিন্সিপাল। বিবাদী নং ৩৩ এর ক্ষেত্রে, নবম শ্রেণীর একজন ছাত্রীকে বেত্রাঘাত করা হয়েছিলো নির্ধারিত পোশাক না পড়ার জন্য। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক প্রস্তুতকৃত রিপোর্টে জানা যায়, ছাত্রীটিকে বোরখা না পড়ার জন্য মারা হয়েছিলো এবং সে এর প্রতিবাদ করলে তাকে বলপেন দিয়ে চোখে আঘাত করা হয়েছিলো। তার বাবা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেছিলো, কিন্তু চুড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করা হয় এই মর্মে যে, ঐ ছাত্রীটিকে একটি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো হবে।

৪২. উপরের উদাহারণগুলো শারীরিক শাস্তির সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত। বিবাদী নং ৩১ এর ক্ষেত্রে ১০ বছরের একটি শিশু আত্মহত্যা করেছিলো যখন তার শিক্ষক তার বিরুদ্ধে টাকা চুরির অভিযোগ এনেছিলো। সেই শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে এবং এর একটি বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছিলো, যা এখনো চলছে। অনেকগুলো ঘটনা শিক্ষকদের ফৌজদারী অপরাধমূলক কার্যের প্রমাণ দেয়, যার ফলাফলস্বরূপ শিক্ষার্থীরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র সুষ্ঠু তদন্তের অভাবে কোন ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়নি এবং সালিশের মাধ্যমে নিস্পত্তি হয়। আমরা বিবাদী নং ৫ যিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং বিবাদী নং ৬ যিনি নারী ও শিশু মন্ত্রনালয়ের সচিব, তাদের কাছ থেকে কোন সাড়া পাইনি। আমরা আশা করছি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব এটি নিশ্চিত করবেন যে কোন শিক্ষকের বিরুদ্ধে আনীত অপরাধের অভিযোগসমূহ পুলিশ দেশের প্রচলিত আইনানুসারে সঠিকভাবে তদন্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।

৪৩. উপরের কয়েকটি ঘটনা ব্যতীত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কিছু গৃহীত পদক্ষেপ আমাদের উৎসাহিত করেছে। ২১.০৪.২০০৮ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা ডিরেক্টরেট শিক্ষার্থীদের প্রতি সঠিক ব্যবহার করার জন্য একটি পরিপত্রটি প্রণয়ন করেছে। এই সার্কুলার ৫ থেকে ১০ বছরের শিশুদের জন্য এবং বাসাবাড়ী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উভয় ক্ষেত্রেই তাদের প্রতি শারীরিক শাস্তি আরোপ সংক্রান্ত এবং পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সকল প্রকার শারীরিক, মানসিক, অত্যাচার, নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে।

৪৪. ১৮.০৩.২০১০ তারিখে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর আরেকটি সার্কুলার জারী করেন শিশুদের প্রতি অত্যাচার, নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা এবং সঠিক আচরণ বিধি সংক্রান্ত। তবে এটি নিশ্চিত যে, এ সকল সার্কুলার সত্ত্বেও স্কুলগুলোতে এখনও শারীরিক শাস্তি প্রদান করা হচ্ছে। ইউনিসেফ কর্তৃক আরেকেটি রিপোর্টে প্রকাশিত হয় যে, শিশুদের প্রতি মানসিক অত্যাচার, নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি শিশুদের মনে স্কুল সম্পর্কে ভীতি ও অনাগ্রহ সৃষ্টি করে এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ স্কুলে যাওয়া বন্ধও করে দেয়। পরবর্তীতে শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করা হয় যে, শিশুদের প্রতি যেন শারীরিক মানসিক অত্যাচার, নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি না করা হয় এবং এরই প্রেক্ষিতে শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।

৪৫. পরবর্তীতে ০৯.০৮.২০০৮ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি পরিপত্র জারী করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নং:৩৭.০৩১.০০৪.০২.০০.১৩৪.২০১০-৪৫১ তারিখ: ২৫ শ্রাবণ ১৪১৭ ব:
০৯ আগষ্ট ২০১০খ্রি:

পরিপত্র

বিষয়: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীদেরকে শারীরিক শাস্তি প্রদান বন্ধকরণ প্রসঙ্গে।

লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, সরকারি-বেসরকারি কোনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র/ছাত্রীদেরকে শিক্ষক/ শিক্ষিকাগণ কর্তৃক প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম শৃঙ্খলা ও পাঠ শিক্ষণে অবহেলা বা অন্যবিধ কারণে অস্বাভাবিক ও নির্মম শারীরিক শাস্তি প্রদান করা হচ্ছে। সংবাদ মাধ্যমে এ ধরণের সংবাদ প্রায়শঃই প্রকাশিত হতে দেখা যায়।
ছাত্র/ছাত্রীদের সু-শিক্ষার স্বার্থে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটানো, প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করা একজন শিক্ষকের দায়িত্ব। শারীরিক শাস্তি প্রদানে শিক্ষার্থীর বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। এর ফলে কাংখিত শিখন ফল অর্জন করা সম্ভব নয়। শারীরিক শাস্তি প্রদান এ কারণে সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি প্রদান অবিলম্বে বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী বলে বিবেচিত হওয়ায় এ লক্ষ্যে নিম্নরূপ নির্দেশনা জারী করা হলো:

১। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি প্রদান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হলো;
২। শারীরিক শাস্তি প্রদান অসদাচরণ হিসেবে গণ্য করা হবে;
৩। জেলা শিক্ষা অফিসার এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসার শারীরিক শাস্তি প্রদান বন্ধ করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নেবেন; শারীরিক শাস্তি প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দন্ডবিধি ১৮৬০, ১৯৭৪ সালের শিশু আইন এবং ক্ষেত্রমতে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;
৪। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি প্রদান বন্ধের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন;
৫। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি প্রদানকারী শিক্ষকগণকে চিহ্নিত করে বিধি মোতাবেক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
৬। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে দপ্তর, অধিদপ্তর ও শিক্ষা বোর্ডসমূহের পরিদর্শকগণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শনকালে শারীরিক শাস্তি প্রদানের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবেন এবং এ বিষয়ে পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করবেন।

৪৬. পরবর্তীতে শিক্ষা পরিচালনা অধিদপ্তর ২৩.০৮.২০১০ তারিখ একটি সংক্ষিপ্ত স্মারক জারী করেন। উক্ত স্মারকে এটিই প্রকাশিত হয় যে, বাসাবাড়ীতে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিশুরা শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতিত হচ্ছে। এতে তাদের মনের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। এ কারণেই সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিশুদের উপর সকল প্রকার শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা বন্ধের জন্য নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছিলো এবং সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষককে তা অবহিত করাও হয়েছিলো। অর্থাৎ শারীরিক শাস্তি বন্ধের জন্য শুধু নিষেধাজ্ঞা জারী নয় বরং শারীরিক শাস্তি বন্ধের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিলো। কিন্তু তারপরও ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী বেশ কিছু এলাকায় শারীরিক শাস্তির ঘটনা ঘটে যার প্রেক্ষিতে আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলাম। পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় "শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদান নিষিদ্ধকরণ নীতিমালা ২০১০" প্রণয়ন করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এই নীতিমালার মধ্যে এই দিকনির্দেশনা রয়েছে যে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিশুরা শারীরিক শাস্তির শিকার হবেনা।

(যেমন, শরীর বা শরীরের যেকোনো অংশের উপর হাত পা বা যেকোনো বস্তু দিয়ে আঘাত, শিশুকে কানে ধরিয়ে উঠাবসা করানো, টেবিল বা বেঞ্চের নিচে মাথা দিয়ে দাড় করানো কিংবা শিশুকে দিয়ে এমন কোনো কাজ করানো যা শ্রম আইন দ্বারা বারিত)। উক্ত নীতিমালায় এটিও উল্লিখিত রয়েছে যে, যদি কোনো শিক্ষক তার প্রতিষ্ঠানের কোনো শিশুর উপর শারীরিক শাস্তি আরোপ করে, তবে তার এই আচরণ "অসদাচরণ" হিসেবে বিবেচিত হবে। অভিযুক্ত শিক্ষক "ফৌজদারী কার্যবিধি" এর অধীনেও শাস্তিযোগ্য হবেন। যাইহোক, বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক আইন হিসেবে আর কোনো আইন নেই। তাই আমাদের মতে, এই সকল শিক্ষকদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পৃথক আইন থাকা দরকার।

৪৭. এই আদালত দ্বারা রুলটি জারী হওয়ার পর মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে ২৯.০৮.২০১০ তারিখ শারীরিক শাস্তি দূরীকরণে দিকনির্দেশনা জারীকরণের জন্য বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকের প্রস্তাব সমূহের মধ্যে একটি ছিলো বিদ্যালয় শারীরিক শাস্তি দূরীকরণের বিষয়টি যেনো গণমাধ্যম যেমন, রেডিও, টেলিভিশন, টিভি চ্যানেল, জাতীয় পত্রিকা, লিফলেট, পোস্টার ইত্যাদি ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়।

৪৮. আমরা এই নির্দেশনা সমূহের যথাযথ সময়ে (৩১ অক্টোবর ২০১০) প্রকাশনার ব্যাপারটিকে প্রশংসনীয় দৃষ্টিতে দেখছি। বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৫(৫) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেয়া যাবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেয়া যাবে না। উপরন্তু বাংলাদেশ ১৯৮৯ সালের শিশু অধিকার সনদের স্বাক্ষরকারী হিসেবে এর প্রতিটি বিধান কার্যকর করা সদস্যের জন্য বাধ্যতামূলক। প্রসঙ্গক্রমে, আমরা *হোসেন মুহাম্মদ এরশাদ বনাম বাংলাদেশ এবং অন্যান্য*, ২১ *বিএলডি (এডি)* ৬৯ এই কেসটির সিদ্ধান্ত উল্লেখ করতে পারি, যেখানে বিজ্ঞ বিচারপতি বি বি রায় চৌধুরী মন্তব্য করেছেন :

> "আমি মনে করি জাতীয় আদালত সমূহের কখোনোই আর্ন্তজাতিক বিধিবিধানসমূহ যা একটি রাস্ট্র অনুমোদন করে, সরাসরিভাবে অমান্য করা উচিত নয়। যদি দেশীয় আইনগুলো যথেষ্ট সমৃদ্ধ নাও হয়। তবে জাতীয় আদালতগুলোর আর্ন্তজাতিক বিধানসমূহের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।"

৪৯. একইরকম ভাবে *রাস্ট্র বনাম মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার*, ৬০ *ডিএলআর* ৬৬০ মামলার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সনদের একজন সাক্ষ্য প্রদানকারী রাস্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ উক্ত সনদের বিধানসমূহ মান্য করতে বাধ্য।

৫০. এই সনদের অনুচ্ছেদ ২৮ এর আলোকে আমরা এ কথা অবশ্যই বলতে পারি যে, শিশুদের উপর শারীরিক শাস্তি তা বাসাবাড়ী, কর্মক্ষেত্র বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেখানেই হোক না কেন, অবশ্যই নিষিদ্ধ করতে হবে। শারীরিক শাস্তি শিশুদের স্বাধীন ও স্বাভাবিক বিকাশকে চরমভাবে বাধাগ্রস্ত করে, তাদের শিক্ষাজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, জীবনযাত্রার মান নিম্নগামী করে। পাশাপাশি তা দারিদ্রতার চক্রের দিকে মোড় নেয়।

৫১. বর্তমান বিশ্বে উন্নত অনুন্নত এমন অনেক দেশ আছে যারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং বাসাবাড়ীতে শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করেছে। তাই শিশুদের মঙ্গলের জন্য দেশের সর্বস্থানে শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করা বাঞ্ছনীয় যারা দেশের ভবিষ্যত নাগরিক এবং পতাকা বাহক। প্রতিটি বাবা-মা, শিক্ষক এবং অন্যান্যদের মধ্যে ইতিবাচক সচেতনতামূক মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে যে, তাদের দায়িত্ব রয়েছে শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও মানবিক যত্ন নেওয়ার।

৫২. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিশুদের উপর শারীরিক শাস্তি বারিত করার এ নিষেধাজ্ঞাকে কার্যকর করতে হলে সর্বপ্রথম যেসব আইনানুসারে অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, সেসব আইনকে সংশোধন করতে হবে। তাই শিক্ষামন্ত্রণালয়ের প্রতি আমাদের নির্দেশনা, সরকারী বেসরকারী যে কোনো প্রকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষক যদি শারীরিক শাস্তি প্রদানের দায়ে অভিযুক্ত হন, তবে তার এই আচরণ "অসদাচরণ" বলে গণ্য হবে। একইভাবে কোনো শিক্ষক যদি শারীরিক শাস্তি প্রদানের দায়ে অভিযুক্ত হন, তবে তার বিরুদ্ধে সেইরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যা "চাকুরীবিধি"তে "অসদাচরণ"এর শাস্তি হিসেবে উল্লিখিত। সেই সাথে ফৌজদারী অপরাধ সংঘটনের জন্য প্রচলিত আইনেও তার শাস্তি হবে।

৫৩. শারীরিক শাস্তি নিয়ন্ত্রনের ব্যপারে সেটা ঘরে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেখানেই হোক না কেন, সরকারকে নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে, শিশু আইন ১৯৭৪ সংশোধন করার জন্য ও অভিভাবক এবং মালিকপক্ষের ক্ষেত্রে শারীরিক শাস্তি আরোপকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করার জন্য।

৫৪. আমরা আরও মতামত প্রকাশ করছি যে, যেসব আইন শারীরিক শাস্তি অনুমোদন করে যেমন দণ্ডবিধি, ফৌজদারী কার্যবিধি, রেলওয়ে বিধি, সেনানিবাস বিশুদ্ধ খাবার আইন, চাবুক আইন, শিশু নীতি ১৯৭৬ এবং অন্যান্য যে সকল আইনে কোন ব্যক্তি বা শিশুকে চাবুক মারা বা বেত্রঘাত করার সর্মথন করা হয় সে সব আইনসমূহ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাতিল করা উচিত এই মর্মে যে, এই বিধিগুলো সাংবিধানিকমতে নিশ্চিত মৌলিক অধিকার পরিপন্থী।

৫৫. উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ এবং নির্দেশনা অনুযায়ী এ রুলটি নিষ্পত্তি করা হল।

৫৬. আমরা বিজ্ঞ আইনজীবী, যারা আমাদের মূল্যবান মতামত দিয়েছেন, তাদেরও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

৫৭. এই রায়ের অনুলিপি শিক্ষা মন্ত্রনালয়, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় এবং নারী ও শিশু মন্ত্রনালয়ে সাথে সাথে প্রদান করা হোক।

বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ
আমি একমত।

(যেমন, শরীর বা শরীরের যেকোনো অংশের উপর হাত পা বা যেকোনো বস্তু দিয়ে আঘাত, শিশুকে কানে ধরিয়ে উঠাবসা করানো, টেবিল বা বেঞ্চের নিচে মাথা দিয়ে দাড় করানো কিংবা শিশুকে দিয়ে এমন কোনো কাজ করানো যা শ্রম আইন দ্বারা বারিত)। উক্ত নীতিমালায় এটিও উল্লিখিত রয়েছে যে, যদি কোনো শিক্ষক তার প্রতিষ্ঠানের কোনো শিশুর উপর শারীরিক শাস্তি আরোপ করে, তবে তার এই আচরণ "অসদাচরণ" হিসেবে বিবেচিত হবে। অভিযুক্ত শিক্ষক "ফৌজদারী কার্যবিধি" এর অধীনেও শাস্তিযোগ্য হবেন। যাইহোক, বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক আইন হিসেবে আর কোনো আইন নেই। তাই আমাদের মতে, এই সকল শিক্ষকদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পৃথক আইন থাকা দরকার।

৪৭. এই আদালত দ্বারা রুলটি জারী হওয়ার পর মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে ২৯.০৮.২০১০ তারিখ শারীরিক শাস্তি দূরীকরণে দিকনির্দেশনা জারীকরণের জন্য বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকের প্রস্তাব সমূহের মধ্যে একটি ছিলো বিদ্যালয় শারীরিক শাস্তি দূরীকরণের বিষয়টি যেনো গণমাধ্যম যেমন, রেডিও, টেলিভিশন, টিভি চ্যানেল, জাতীয় পত্রিকা, লিফলেট, পোস্টার ইত্যাদি ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়।

৪৮. আমরা এই নির্দেশনা সমূহের যথাযথ সময়ে (৩১ অক্টোবর ২০১০) প্রকাশনার ব্যাপারটিকে প্রশংসনীয় দৃষ্টিতে দেখছি। বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৫(৫) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেয়া যাবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেয়া যাবে না। উপরন্তু বাংলাদেশ ১৯৮৯ সালের শিশু অধিকার সনদের স্বাক্ষরকারী হিসেবে এর প্রতিটি বিধান কার্যকর করা সদস্যের জন্য বাধ্যতামূলক। প্রসঙ্গক্রমে, আমরা *হোসেন মুহাম্মদ এরশাদ বনাম বাংলাদেশ এবং অন্যান্য*, ২১ *বিএলডি (এডি)* ৬৯ এই কেসটির সিদ্ধান্ত উল্লেখ করতে পারি, যেখানে বিজ্ঞ বিচারপতি বি বি রায় চৌধুরী মন্তব্য করেছেন :

> "আমি মনে করি জাতীয় আদালত সমূহের কখোনোই আর্ন্তজাতিক বিধিবিধানসমূহ যা একটি রাস্ট্র অনুমোদন করে, সরাসরিভাবে অমান্য করা উচিত নয়। যদি দেশীয় আইনগুলো যথেষ্ট সমৃদ্ধ নাও হয়। তবে জাতীয় আদালতগুলোর আর্ন্তজাতিক বিধানসমূহের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।"

৪৯. একইরকম ভাবে *রাস্ট্র বনাম মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার*, ৬০ *ডিএলআর* ৬৬০ মামলার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সনদের একজন সাক্ষ্য প্রদানকারী রাস্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ উক্ত সনদের বিধানসমূহ মান্য করতে বাধ্য।

৫০. এই সনদের অনুচ্ছেদ ২৮ এর আলোকে আমরা এ কথা অবশ্যই বলতে পারি যে, শিশুদের উপর শারীরিক শাস্তি তা বাসাবাড়ী, কর্মক্ষেত্র বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেখানেই হোক না কেন, অবশ্যই নিষিদ্ধ করতে হবে। শারীরিক শাস্তি শিশুদের স্বাধীন ও স্বাভাবিক বিকাশকে চরমভাবে বাধাগ্রস্ত করে, তাদের শিক্ষাজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, জীবনযাত্রার মান নিম্নগামী করে। পাশাপাশি তা দারিদ্রতার চক্রের দিকে মোড় নেয়।

৫১. বর্তমান বিশ্বে উন্নত অনুন্নত এমন অনেক দেশ আছে যারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং বাসাবাড়ীতে শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করেছে। তাই শিশুদের মঙ্গলের জন্য দেশের সর্বস্থানে শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করা বাঞ্ছনীয় যারা দেশের ভবিষ্যত নাগরিক এবং পতাকা বাহক। প্রতিটি বাবা-মা, শিক্ষক এবং অন্যান্যদের মধ্যে ইতিবাচক সচেতনতামূক মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে যে, তাদের দায়িত্ব রয়েছে শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও মানবিক যত্ন নেওয়ার।

৫২. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিশুদের উপর শারীরিক শাস্তি বারিত করার এ নিষেধাজ্ঞাকে কার্যকর করতে হলে সর্বপ্রথম যেসব আইনানুসারে অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, সেসব আইনকে সংশোধন করতে হবে। তাই শিক্ষামন্ত্রণালয়ের প্রতি আমাদের নির্দেশনা, সরকারী বেসরকারী যে কোনো প্রকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষক যদি শারীরিক শাস্তি প্রদানের দায়ে অভিযুক্ত হন, তবে তার এই আচরণ "অসদাচরণ" বলে গণ্য হবে। একইভাবে কোনো শিক্ষক যদি শারীরিক শাস্তি প্রদানের দায়ে অভিযুক্ত হন, তবে তার বিরুদ্ধে সেইরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যা "চাকুরীবিধি"তে "অসদাচরণ"এর শাস্তি হিসেবে উল্লিখিত। সেই সাথে ফৌজদারী অপরাধ সংঘটনের জন্য প্রচলিত আইনেও তার শাস্তি হবে।

৫৩. শারীরিক শাস্তি নিয়ন্ত্রনের ব্যপারে সেটা ঘরে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেখানেই হোক না কেন, সরকারকে নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে, শিশু আইন ১৯৭৪ সংশোধন করার জন্য ও অভিভাবক এবং মালিকপক্ষের ক্ষেত্রে শারীরিক শাস্তি আরোপকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করার জন্য।

৫৪. আমরা আরও মতামত প্রকাশ করছি যে, যেসব আইন শারীরিক শাস্তি অনুমোদন করে যেমন দণ্ডবিধি, ফৌজদারী কার্যবিধি, রেলওয়ে বিধি, সেনানিবাস বিশুদ্ধ খাবার আইন, চাবুক আইন, শিশু নীতি ১৯৭৬ এবং অন্যান্য যে সকল আইনে কোন ব্যক্তি বা শিশুকে চাবুক মারা বা বেত্রঘাত করার সর্মথন করা হয় সে সব আইনসমূহ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাতিল করা উচিত এই মর্মে যে, এই বিধিগুলো সাংবিধানিকমতে নিশ্চিত মৌলিক অধিকার পরিপন্থী।

৫৫. উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ এবং নির্দেশনা অনুযায়ী এ রুলটি নিষ্পত্তি করা হল।

৫৬. আমরা বিজ্ঞ আইনজীবী, যারা আমাদের মূল্যবান মতামত দিয়েছেন, তাদেরও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

৫৭. এই রায়ের অনুলিপি শিক্ষা মন্ত্রনালয়, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় এবং নারী ও শিশু মন্ত্রনালয়ে সাথে সাথে প্রদান করা হোক।

বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ
আমি একমত।

৬. শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
আইনসেল

নং: ৩৭.০৩১.০০৪.০২.০০.১৩৪.২০১০-১৫১. তারিখ: ০৮ বৈশাখ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ
২১ এপ্রিল ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ

পরিপত্র

বিষয়: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১১।

দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশু অধিকার সংরক্ষণ এবং শিশুদের মানসিক বিকাশের জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতকরণে সরকার বদ্ধপরিকর। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুদের শারিরীক ও মানসিক শাস্তির ফলে একদিকে যেমন শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হয়, অন্যদিকে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। শারিরীক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আনন্দঘন পরিবেশ বজায় থাকবে এবং শিশুরা সুন্দরভাবে গড়ে উঠবে। তাই সরকার কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের শারিরীক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা সংক্রান্ত নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো:-

০২। নীতিমালার শিরোনাম।- এই নীতিমালা "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের শারিরীক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১১" নামে অভিহিত হবে।

এই নীতিমালায়-

(ক) "শিক্ষা প্রতিষ্ঠান"বলতে –
সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসাসহ (আলিম পর্যন্ত) সহ অন্যান্য সকল ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-কে বুঝাবে।

(খ)"শিক্ষক" বলতে উপানুচ্ছেদ "ক"এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক-কে বুঝাবে।

(গ)"শিক্ষার্থী" বলতে উপানুচ্ছেদ "ক" এ উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষা গ্রহণকারী সকল ছাত্র ছাত্রীকে বুঝাবে।

(ঘ)"কর্মকর্তা ও কর্মচারী" বলতে উপানুচ্ছেদ 'ক' এ উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারী-কে বুঝাবে।

(ঙ)"শাস্তি" বলতে কোন ছাত্র-ছাত্রী-কে 'ঙ' (১) ও 'ঙ' (২)-এ বর্ণিত শারীরিক কিংবা মানসিক শাস্তি-কে বুঝাবে।

১) শারীরিক শাস্তি:
শারীরিক শাস্তি বলতে যে কোনো ছাত্র-ছাত্রীকে যে কোনো ধরণের দৈহিক আঘাত করাকে বুঝাবে। যেমন-
(ক) কোন ছাত্র-ছাত্রীকে হাত-পা বা কোনো কিছু দিয়ে আঘাত করা/বেত্রাঘাত করা;
(খ) শিক্ষার্থীর দিকে চক/ডাস্টার বা এ জাতীয় যে কোনো যে কোনো বস্তু ছুঁড়ে মারা;
(গ) আছাড় দেয়া ও চিমটি কাটা;
(ঘ) শরীরের কোনো স্থানে কামড় দেয়া;

চলমান পাতা /২

(ঙ) চুল ধরে টানা বা চুল কেটে দেয়া;
(চ) হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে পেন্সিল চাপা দিয়ে মোচড় দেয়া;
(ছ) ঘাড় ধরে ধাক্কা দেয়া;
(জ) কান ধরে টানা বা উঠবস করানো;
(ঝ) চেয়ার, টেবিল বা কোন কিছুর নীচে মাথা দিয়ে দাঁড় করানো বা হাটুগেরে দাঁড় করে রাখা;
(ঞ) রোদে দাঁড় করে বা শুইয়ে রাখা কিংবা সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড় করে রাখা;
(ট) ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে এমন কোনো কাজ করানো যা শ্রম আইনে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

(২) মানসিক শাস্তি:
কোন শিক্ষার্থীকে শ্রেণী কক্ষে এমন কোন মন্তব্য করা যেমন: মা-বাবা/বংশ পরিচয়/গোত্র/বর্ণ/ধর্ম ইত্যাদি সর্ম্পকে অশালীন মন্তব্য করা, অশোভন অঙ্গভঙ্গী করা বা এমন কোনো আচরণ করা যা শিক্ষার্থীর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে।

০৩। কোন শিক্ষক-শিক্ষিকা কিংবা শিক্ষা পেশায় নিয়োজিত কোন ব্যক্তি অথবা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী পাঠদানকালে কিংবা অন্য কোন সময় ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদানকালে কিংবা অন্য কোন সময় ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে ২(ঙ)(১) ও (২) নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত কোন আচরণ করবে না যা শাস্তি হিসেবে গণ্য হয়। ২(ঙ) (১) ও (২) নং অনুচ্ছেদে এর অপরাধসমূহের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে তা ১৯৭৯ সালের সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী হবে এবং শাস্তিমূলক অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। উক্তরূপ অভিযোগের জন্য তার বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর আওতায় অসদাচরণের অভিযোগে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। প্রয়োজনে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইনেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

০৪। অনুচ্ছেদ ০২ এর (খ) ও (ঘ)-এ বর্ণিত ব্যক্তি যাদের ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ কিংবা সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ প্রযোজ্য নয়, তারা অনুচ্ছেদ ০২ এর (ঙ) (১) ও (২)-এ বর্ণিত অভিযোগে অভিযুক্ত হলে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইনে কিংবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

০৫। শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান/ব্যবস্থাপনা কমিটি/শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ/স্থানীয় প্রশাসন/শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও শিক্ষা বোর্ড সমূহ-কে একযোগে প্রচারনামূলক কাজ করতে হবে।

০৬। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, শিক্ষক-কর্মচারীগণের করণীয়:
(ক) শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্র এবং প্রণীত নীতিমালার বাস্তবায়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন;
(খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান সংশ্লিষ্ট সকল-কে শারীরিক শাস্তির কুফল সর্ম্পকে অবহিত করবেন;
(গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা/ব্যবস্থাপনা কমিটি রেজুলেশনের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বন্ধের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ/সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করবেন;
(ঘ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং শিক্ষা প্রশাসন সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত মনিটরিং করবেন এবং নীতিমালা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবেন;
(ঙ) ছাত্র ছাত্রীদেরকে পাঠ্যক্রম ও সহপাঠ্যক্রম বর্হিভূত শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করানো যাবে না;

চলমান পাতা /৩

(চ) ছাত্র ছাত্রীদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে উৎসাহিত করা যাবে না;

(ছ) শারীরিক ও মানসিক শাস্তির প্রকৃতি সর্ম্পকে অভিভাবকদের সচেতন করতে হবে যাতে অহেতুক অভিযোগ উত্থাপিত না হয়;

(জ) শারীরিক ও মানসিক শাস্তির প্রতিরোধ বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, দপ্তর, অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন;

(ঝ) শিক্ষা কার্যক্রমকে আরও আর্কষণীয় ও আনন্দময় করার জন্য পাঠদান পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে;

০৭। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা সংক্রান্ত নীতিমালায় বর্ণিত পদক্ষেপসমূহ কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহন করবে।

০৮। সরকার প্রয়োজন মোতাবেক সময়ে সময়ে প্রণীত নীতিমালাটি পরিবর্ধন/সংযোজন/বিয়োজন করতে পারবে।

০৯। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা সংক্রান্ত নীতিমালার কঠোর প্রয়োগ এবং এ ধরণের কাজ-কে নিরুৎসাহিত করার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করবে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীগণ বিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ায় আরও আগ্রহী/উৎসাহিত হবে, মেধার বিকাশ ঘটবে এবং দক্ষ মানব সম্পদ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

১০। এ নীতিমালাটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাঃ/-
২১/৪/২০১১
(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)
সচিব

নং: ৩৭.০৩১.০০৪.০২.০০.১৩৪.২০১০-১৫১(১৯) তারিখ: ০৮ বৈশাখ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ
২১ এপ্রিল ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ

বিতরনঃ কার্যার্থেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ/উন্নয়ন), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। যুগ্ম-সচিব (মাধ্যমিক/ কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়/অডিট ও আইন/ মাদরাসা ও কারিগরী), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা(তাঁর অধীনস্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নীতিমালাটি ব্যাপক প্রচারের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)
৪। চেয়ারম্যান,মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/কুমিল্লা/যশোর/সিলেট/বরিশাল/দিনাজপুর/বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা (তাঁর অধীনস্থ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নীতিমালাটি ব্যাপক প্রচারের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধকরা হলো)
৫। উপ-সচিব (মাধ্যমিক/কলেজ/অডিট/মাদরাসা/কারিগরি/উন্নয়ন-১,২,৩,৪/শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৬। উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা,ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/সিলেট/খুলনা/ময়মনসিংহ/বরিশাল/কুমিল্লা/রংপুর অঞ্চল

অনুলিপি:

অবগতির জন্যঃ
১। মাননীয় মন্ত্রির একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা

(উত্তম কুমার মন্ডল)
উপ-সচিব (অডিট)
ফোন ৭১৬৪৩০৬